সম্পাদকীয়র পরিবর্তে

ওরা যখন মুসলমানদের খুন করছিলো
আমি প্রতিবাদ করিনি
কারণ আমি তো মুসলমান নই

ওরা যখন দলিতদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিলো
আমি নির্বাক ছিলাম
কারণ আমি তো দলিত নই

ওরা যখন ও বি সি দের অবজ্ঞা করছিলো
আমি কথা বলিনি
কারণ আমি তো ও বি সি নই

ওরা যখন আদিবাসীদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে
জল-জমি-জঙ্গল কেড়ে নিচ্ছিলো
আমি দুটো কথাও লিখিনি
কারণ আমি তো আদিবাসী নই

ওরা যখন একের পর এক মহিলাদের ধর্ষণ করছিলো
আমি প্রতিবাদ মিছিলে যাইনি
কারণ আমি তো নারী নই

ওরা যখন গৌরী লঙ্কেশ, নরেন্দ্র দাভোলকরকে খুন করলো
আমার রাতের ঘুমে কোনো ব্যাঘাত হয়নি
কারণ আমি তো মুক্তমনা নই

এরপর ওরা যখন আমাকেই খুন করতে এলো
আমার আর্তনাদে কেউই সাড়া দিলো না
কারণ আমি একান্তই একা, নিঃসঙ্গ নিঃসঙ্ঘ তাই

মার্কসবাদ ও রামরাজ্য
রাহুল সাংকৃত্যায়ন ৩

হরিজনদের হিন্দুধর্ম ত্যাগ: গান্ধী বনাম রবীন্দ্রনাথ
আশীষ লাহিড়ী ৮

প্রতীত্যসমুৎপাদ
(গড়িয়া বৌদ্ধবিহারে ২৫৪৩ তম বুদ্ধ জয়ন্তীতে আমন্ত্রিত ভাষণ)
গুণধর বর্মণ ১৫

মতুয়া ক্রোড়পত্র:
মতুয়া এক মুক্তিসেনার নাম
মনোরঞ্জন ব্যাপারী ৩৪

দুই মহান ধর্মগুরু হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ এবং
মতুয়া ধর্মান্দোলন নিয়ে একটি প্রাথমিক পাঠ
সুশান্ত কর ৩৯

হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বনাম মতুয়া মহাসঙ্ঘ
হর্ষবর্দ্ধন চৌধুরী ৫৫

ব্রাহ্মণ্যবাদের নতুন আঁতুরঘর
অনন্ত আচার্য ১০২

কবিতা: ভারতবর্ষ মানে
দেবেশ ঠাকুর ১১২

কৃতজ্ঞতা - টুটুন মুখার্জী, শুভঙ্কর বর্মন, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ-আম্বেদকর চেতনা মঞ্চ

মার্কসবাদ ও রামরাজ্য - দুটি কথা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

শ্রীযুক্ত ত্রী সম্বৎ করপাত্রী ২০১৪ (ইং ১৯৫৭)-তে *'মার্কসবাদ ও রামরাজ্য'* নামে আটশো ষোলো পৃষ্ঠার একখানি বিশাল পুস্তক প্রকাশ করেছেন। মূল বইটি অবশ্য সংস্কৃতে লেখা। বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত বাসুদেব ব্যাস বইটির হিন্দি অনুবাদ করেছেন। করপাত্রীও বিংশ শতাব্দীর লোক নন, তিনি হাজার বছর কিংবা তাঁর লেখানুসারে কোটি কোটি বছরের পুরোনো পৃথিবীর মানুষ। তিনি যে সময়ের মানুষ, তখন পৃথিবী সূর্যপিণ্ড থেকে পৃথক হয়েছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য তিনি নিরাকার ব্রহ্ম ব্যতীত আর সমস্ত কিছুকেই ভ্রম বলে মনে করেন। তাঁর পক্ষে এমন ভাবাটাই স্বাভাবিক।

করপাত্রী মহারাজ কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ আটকানোর জন্য যে মহাযজ্ঞ করেছিলেন, তাতে দেশের আইনভঙ্গের দায়ে তাঁর কারাবাস হয়। আর তারপরই লেখনী তাঁর হাতে এসে চমৎকারিত্ব দেখাতে শুরু করে। বেচারা কারাগারেও ভক্তদের আতিশয্যে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। 'কারা অধিকর্তারা স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি রাখেননি। দিন রাত দর্শনার্থীদের সমাগম লেগেই থাকত'। সেজন্য কারাগারেও তাঁর একান্ত সময় খুব কমই জুটত। কারা অধিকর্তারা তো সামান্য লোক, এরকম একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য দেবতারাও লালায়িত থাকেন। কারাগারে অস্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টা তো শুধুমাত্র কমিউনিস্টদের জন্য, যাদের দিল্লির মহাদেব থেকে আরম্ভ করে প্রান্তীয় ছোটখাট দেবতারাও সুযোগ পেলে দু'কথা শোনার এবং এদের সব সময়ের জন্যই যাতে কারাগারের ভেতরেই রাখা যায়, তেমন সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে।

বইটি থেকে অন্য যে সমস্ত গ্রন্থাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা গেছে যে সমস্ত বিষয়টি এই সত্যযুগীয় মহাত্মার আয়ত্তের বাইরে। মনে হয়,

বেশ কিছু শিষ্যদের সহায়তাও অন্তরাল থেকে বইটি প্রকাশে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। সমস্ত পৃষ্ঠাই গুরুর নামে প্রকাশিত হবার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। এমনিতেই অদ্বৈতবাদে গুরু-শিষ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। হৃষিকেশের এক অগ্রণী মহাত্মাও এ বিষয়ে পথিকৃৎ। তাঁর এক শিষ্য হিন্দি এবং ইংরেজিতে যাই লেখেন, তা সবই গুরুর নামে প্রকাশিত হয়।

কোনো পরিকল্পনা অনুসারে বিষয়ের পরম্পরা বজায় রেখে বইটি লেখা হয়নি। যার ফলে সমস্ত বিষয়টিকে ক্রমপর্যায়ে ভাগ করা এক দুরুহ ব্যাপার। একই কথা এবং বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বইটির আর একটি বাধা। বইটি তাড়াতাড়ি শেষ করার দিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৫৬ সালের 'চাতুর্মাস্য' কাশীতে উদ্‌যাপন করা হয়। যদিও কাশী মহারাজকে বিশ্বনাথ মন্দির থেকে বঞ্চিত করেছিল, কিন্তু চক্ষুষ্মান হয়েও 'গাঁঠরি বাঁধতে ওস্তাদ' বানিয়াদের জন্য এই বইটি তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। 'কল্যাণ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রী জানকীনাথ শর্মা এবং 'শ্রীধর্ম সংঘ শিক্ষা মণ্ডলের শ্রী হরিহর নাথ ত্রিপাঠি' যথেষ্ট পরিশ্রম করে সমস্ত বিষয়কে ক্রমবদ্ধ করার যথাসাধ্য প্রয়াস করেছেন।

প্রকাশনা বিষয়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্ন ছিল না, কারণ 'শেঠ বানিয়া'দের কাছে বইটি বাইবেল তুল্য। গীতাপ্রেস, গোরখপুর বইটি ছাপার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। উৎকৃষ্ট কাগজে, সুন্দর টাইপে ছাপা ৮১৬ পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের, কাপড়ে বাঁধাই বইটির দাম যে কোনো প্রকাশকই দশ বারো টাকার কম ধার্য করত না। কিন্তু বইটির দাম মাত্র চার টাকা করা হয়েছে। অতএব এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে বইটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে লিখিত ও প্রকাশিত। বস্তুত বইটির দাম হওয়া উচিত ছিল এক টাকা। শেঠদের 'ধর্মভাণ্ডারে' অর্থের তো আর অভাব নেই। তিন হাজারের পরিবর্তে তিরিশ হাজারের সংস্করণ হওয়া সংগত ছিল। বইটির প্রস্তাবনার রচয়িতা শ্রীগঙ্গাশংকর মিশ্রের মতে, 'এখনও পর্যন্ত এমন কোনো পুস্তক রচিত হয়নি যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্তর্নিহিত সিদ্ধান্তগুলির এত সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃত বিচার করা হয়েছে। বইটির ইংরিজি অনুবাদ হওয়া খুবই প্রয়োজন, যার ফলে বিদেশি পণ্ডিতগণ এবং ভারতীয় বিদ্বজ্জন, যাঁরা হিন্দি জানেন না, তাঁরা উপকৃত হবেন'। আশা করা যায় শেঠ-বণিকেরা মিশ্রজীর এই ইচ্ছাও অপূর্ণ রাখবে না। মিশ্রজীরও লিখেছেন, 'যাঁরা সত্যের সন্ধান করছেন, তাঁরা এই বইটির জন্য স্বামীজীর

কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই ঘটনা যে সত্যসন্ধানীরা বইট পড়ে নিরাশই হবেন, কারণ এখানে ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় সত্য-অঙ্গ সত্যের কোনো ভেদাভেদই মানা হয়নি। বইটির মুখ্য উদ্দেশ্য মার্কসবাদের বিরোধিতা করা। বইটির মুখবন্ধেও 'সাম্যবাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে, 'এই বিষয়টিই বর্তমানে সর্বাধিক আলোচনার বস্তু'। সারা বইয়ে রামরাজ্যের কথা অনেক শোরগোল করেও অল্পই আছে। অবশ্য কোটি বছরের পুরোনো সমাজ সম্পর্কিত ধ্যানধারণা বর্তমানে কোনো গভীর আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে, এমন আশা না করাই ভালো। এতদ্‌সত্ত্বেও বইটি কম চিত্তাকর্ষক নয়--- যদি পড়ার মতো সময় ও ধৈর্য পাঠকের থাকে। বইটি হিন্দিতে হলেও বেশ গুরুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের যথেচ্ছ ছড়াছড়ি। এর ফলে সংস্কৃত না জানা হিন্দি পাঠক ধৈর্য ধরে পৃষ্ঠাচারেকও পড়তে পারবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এর চেয়ে সম্পূর্ণ বইটি সংস্কৃতে লেখা হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। তার ফলে একদিকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সুবিধা হত, অন্যদিকে কয়েক হাজার পাঠক পণ্ডশ্রমের হাত থেকে পরিত্রাণ পেত।

বইটিতে বিধবা স্ত্রীদের পুড়িয়ে মারা--- সতীপ্রথার গুণগান করা হয়েছে। হাজার বছর নয়, মাত্র কিছুকাল আগে আমরা যে অন্ধকার যুগ ফেলে এসেছি, সেই যুগের মতো মেয়েদের বাল্যেই বিবাহ দেবার পক্ষে জোরদার ওকালতি করা হয়েছে। মেয়েদের ঘরের অভ্যন্তরে পর্দার আড়ালেই থাকা উচিত, এটা প্রতিষ্ঠা করার জোরদার প্রয়াস করা হয়েছে। শূদ্র এবং দাসেরাও মহারাজের করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি। উনি দাস প্রথার অনুমোদন করে বলেছেন, 'তারা পরিবারের অংশবিশেষ ছিল এবং তাদের আহার-বস্ত্র-বাসস্থানের দায় তাদের প্রভুরাই বহন করত'। অবশ্য গৃহপালিত গবাদি পশুর দেখাশোনার দায়িত্ব মালিকদের হাতেই থাকে। আবার তাদের বাছুরদের ইচ্ছেমতো এদিক ওদিক বেচে দেবার অধিকারও তারাই ভোগ করে। ১৯২৪ সালে নেপালে দাস-দাসী, স্থানীয়ভাবে যাদের নাম ছিল 'কমারা-কমারি', তাদের মুক্ত করা হয়েছে। রক্ষা এই যে, করপাত্রী স্বামী তখন সেখানে ছিলেন না, নাহলে হয়তো সনাতন ধর্মের রক্ষায় তেমনভাবে ধর্নায় বসতেন, যেমনটি কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে হরিজন প্রবেশের বিরুদ্ধে বসেছিলেন। নেপালের ৫৯,৮৭৩ জন দাস-দাসী মহারাজের 'সনাতন ধর্মের' ওপর পদাঘাত করে মুক্ত হয়ে গেল, আর এমন কোনো ব্যক্তির দেখা পাওয়া গেল না, যে সাহস করে এগিয়ে এসে রাণাচন্দ্র

সমশেরের এই ধর্ম বিরোধী ব্যবস্থার বিরোধিতা করে।

ভগবান যাদের উচ্চবর্ণে জন্ম দিয়ে সমাজে পাঠিয়েছেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের প্রাধান্যই মহারাজের পছন্দ। এ বিষয়ে যথাস্থানে আরও বিশদ ব্যাখ্যা করা যাবে। 'মাথা গোনা' অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কের মতাধিকার তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বস্তু। উনি সত্যযুগ ফিরিয়ে আনতে কৃতসংকল্প, কিন্তু বাধা কলিযুগ। দলিতদের একজন অগ্রণী নেতা এবং সংসদ-সদস্য এন.শিবরাজ ২৭ এপ্রিল, ১৯৫৮ সালে এক জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে এক আমূল পরিবর্তন আনতে হবে, আর পরিবর্তন তখনই আসতে পারে যখন শতকরা ৮০ শতাংশ মানুষের কাছে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতাকে সমর্পণ করে স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ় করা যায়। ভারতে বসবাসকারী দশ কোটি মানুষ যারা দীর্ঘকাল ধরে নানা উৎপীড়ন সহ্য করে আসছে--- আজও অনুসূচিত (হরিজন) জাতির লোকেরা ক্রমশ পিছু হটছে--- প্রায় ছ'কোটি লোক যারা অনুসূচিত জনজাতি (শিডিউল্ড ট্রাইব) নামে আখ্যায়িত , তারা কষ্টকর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। প্রায় বারো কোটি পশ্চাৎপদ শ্রেণি জনতার অবস্থাও অনুরূপ। এই বিশাল সংখ্যার জনতা, যাদের মতাধিকার আছে, তারা কেন তাদের সংখ্যানুপাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে জায়গা পায় না, অথবা তাদের জায়গা দেওয়া হয় না। এদের সঠিক প্রতিনিধিত্বই বা হয় না কেন? বহুসংখ্যক লোক অল্পসংখ্যক হয়ে গেল, আর অল্পসংখ্যকরা সাধারণ মুদিখানা থেকে শুরু করে বিভিন্ন চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ছোটো গ্রাম থেকে আরম্ভ করে রাজধানী দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। অধিকাংশ মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারছে না, আর সামান্য কিছু লোক বিনা শ্রমে বিলাসী জীবন কাটাচ্ছে। বহুজন সমাজকে এই সামান্য সংখ্যক লোক নিরক্ষর পঙ্গু বানিয়ে, তাদের ক্রীতদাস কিংবা তার চেয়েও নিম্নতম অবস্থায় নিয়ে চলেছে'। (মধ্যম মার্গ, ১১ মে ১৯৫৮)।

করপাত্রী মহারাজ এখনও বহুজনের রোষ কি বস্তু, তা জানেন না। জানতে ইচ্ছুক হলে উনি মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু প্রদেশ ঘুরে আসতে পারেন। ওখানেও সনাতন ধর্মের নামে হাজার বছর ধরে শতকরা তিন ভাগ ব্রাহ্মণেরা সমস্ত সম্পদ অধিকার করে রেখেছিল। শতকরা সাতানব্বই ভাগ মানুষকে শূদ্র এবং অতি শূদ্র সংজ্ঞা দিয়ে তাদের নারকীয় জীবন কাটাতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু বহুজন সমাজের এই মিথ্যা, ধোঁকার টাটিকে চিনতে সময় লাগেনি আর তার

ফলে এখন 'ব্রাহ্মণ' নাম শুনলেই তারা ঘৃণায় মুখ ফেরায়। করপাত্রী মহারাজ এবং তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের হঠকারী কার্যকলাপ আমাদের এখানেও সেরকম তিক্ততার বীজ রোপণ করতে পারে। মহারাজের এটা বোঝা উচিত যে, যাদের অধিকারের উপর আঘাত হানার জন্য তিনি খড়্গহস্তে আবির্ভূত, তাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ। মহারাজের বাণী বধিরের কানেই বর্ষিত হোক, তাতেই তাঁর মঙ্গল।

বইটির জবাবে ওরকম সাইজের আর একটি বই লেখার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এ বইয়ের সমস্ত সিদ্ধান্তের জবাব আমার *'বিশ্বের রূপরেখা'*, *'মানব সমাজ'*, *'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ'*, *'ভাগো নহি দুনিয়াকো বদলো'*, *'আজকের রাজনীতি'* ইত্যাদি বইয়ে এসেই গেছে।

মুসৌরি
২৪.৫.৫৮

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

হরিজনদের হিন্দুধর্ম ত্যাগ: গান্ধী বনাম রবীন্দ্রনাথ

আশীষ লাহিড়ী

ব্রিটিশ লেখিকা মার্জোরি সাইকস সবরমতী ও শান্তিনিকেতন দু- জায়গাতেই কিছুদিন করে কাটিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ দুই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার মূল্য ছিল সবচেয়ে বেশি; ব্যক্তিমানুষের যুক্তিভিত্তিক স্বাধীনতার কাছে জাতীয়তা, ধর্ম, পরিবার, সমাজের ভ্রূকুটি সবই উপেক্ষণীয়, যদিও রবীন্দ্রনাথ যে সবসময় নিজের এই আদর্শে অবিচল ছিলেন তা হয়তো বলা চলে না। পক্ষান্তরে গান্ধীজির কাছে কর্তৃত্বটাই বড়ো কথা: ধর্মের কর্তৃত্ব, জাতীয়তার কর্তৃত্ব, পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব, সমাজের বর্ণ-কর্তৃত্ব। গান্ধীজি ছিলেন হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের কট্টর সমর্থক। বংশানুক্রমিক জীবিকার বিভাজন তাঁর কাছে খুব কাম্য ছিল। অর্থাৎ মেথর কিবংা কামারের ছেলে মেথর কিংবা কামারই হবে, অধ্যাপক কিংবা বিমান চালক হবে না, অধ্যাপকের ছেলে অধ্যাপকই হবে, স্যানিটেশন ইঞ্জিনিয়ার কিংবা চাষী হবে না।

বর্ণাশ্রম ও জাতপাত সম্বন্ধে তিনি এতটাই স্পর্শকাতর ছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ভিত্তিতে খিলাফত আন্দোলন চালানোর সময়েও তিনি মুসলমানের ছোঁয়া খাবার খেতেন না, এমনকি আন্দোলনের সহ পরিচালক মৌলানা শওকত ও মৌলানা মহম্মদ আলির ছোঁয়া খাবারও না। তাঁর এই মনোভাব আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে আহত, হয়তো ক্ষুব্ধও করেছিল। গান্ধীজি অবশ্য বলেছিলেন, 'আলি ভ্রাতৃদ্বয় নাকি অতি সযত্নে [তাঁর] এই ধর্মান্ধতাকে শ্রদ্ধা করতেন'। তাঁর মতে ওটা ধর্মান্ধতা নয়, আত্ম-নিগ্রহ। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহর বিরোধিতারও আজব এক যুক্তি দিয়েছিলেন তিনি: 'ভাই-বোনেরা যদি ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতিয়ে, বিবাহের কথা অদৌ মাথায় না এনে জীবন কাটাতে পারে, তাহলে আমার মেয়ের প্রতিটি মুসলমানকে ভাই ভাবার মধ্যে, এবং আমার মেয়েকে প্রতিটি মুসলমানের বোন ভাবার মধ্যে, অসুবিধা কোথায়'।

(দ্রষ্টব্য, সুগত বসু, দ্য মাদার অ্যাজ নেশন, পেঙ্গুইন-ভাইকিং)। পরে অবশ্য গান্ধী তাঁর এ মত বদলে ফেলেছিলেন। বহু অসবর্ণ এবং আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন তিনি। বর্ণাশ্রমের গণ্ডির মধ্যেও জাতপাত নিয়ে কিছুটা উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, যার পরিচয় আমরা পাই কেরালার গুরুভায়ুর মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকারের দাবিতে তাঁর অনশনে। বলাবাহুল্য, এতে করে মূল সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি।

স্বাভাবিকভাবেই গান্ধীজির পিছনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংঘাত বেধেছিল খোলা মনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথের, যিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির লোক ছিলেন না। 'শূদ্রধর্ম' (১৯২৬) প্রবন্ধে নাম না করে গান্ধীজির বর্ণাশ্রম-প্রেমকে তীক্ষ্ণ যুক্তি আর শ্লেষে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন তিনি। তিনি লেখেন, 'স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি, তাই একদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই দেশ। তার নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে গেছে'। 'স্বধর্মরত শূদ্র' বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন সেইসব লোককে যারা মনে করে উচ্চবর্ণের চাকরগিরিই তাদের স্বধর্ম। তারা অনায়াসেই উচ্চবর্ণ মনিবদের নির্দেশে অন্য দেশের বা অন্য ধর্মের খেটে খাওয়া মানুষকে মারতে পারে (চীনে ভারতীয় সৈন্যদের ন্যক্কারজনক ভূমিকার উদাহরণ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ), কিন্তু মনিবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা ভাবতে পারে না। শূদ্র-অসন্তোষকে সামাল দেওয়ার কাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রবর্তিত 'পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিভেদ' খুবই কাজে লেগেছিল বলে তিনি মনে করতেন। কেননা 'রাজশাসনের মধ্য দিয়ে একাজ করতে গেলে তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনোই থামত না'। কিন্তু 'কাজটা পাকা হল ধর্মের শাসনে। বলা হল, এক-একটা জাতির এক-একটা কাজ তার ধর্মেরই অঙ্গ'। গান্ধীজি বলেছিলেন, এক-এক জাতের লোক পুরুষানুক্রমে একই পেশায় নিযুক্ত থাকলে তাদের পেশাদারি নৈপুণ্য ও উৎকর্ষ বাড়ে। বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কিনা ভেবে দেখবার বিষয়'। (কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, প.ব. সরকা, ১৯৯০, ১২-৬১৩)

ইতিহাসবিদ সব্যসাচী ভট্টাচার্যর মতে এই 'শূদ্রধর্ম' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের শ্লেষাত্মক তর্কযুদ্ধ-পটুতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন'। তিনি জানিয়েছেন, ১৯২৭ সালে এই প্রবন্ধটির খুব খারাপ একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মডার্ন রিভিউ কাগজে। এ প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি মন্তব্য: 'এ কথা সুপরিচিত যে ড. বি আর আম্বেদকর তাঁর ''কংগ্রেস ও গান্ধী অস্পৃশ্যদের কী হাল করেছেন'' প্রবন্ধে গান্ধীর যে সমালোচনা করেছিলেন তার মূল কথা ছিল বর্ণাশ্রমের প্রতি গান্ধীর সমর্থন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ প্রবন্ধে ওই ধরনের সমালোচনা করেননি, এখানে তাঁর সুরটা তির্যকভাবে শ্লেষাত্মক'। (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, দ্য পোয়েট অ্যান্ড দ্য মহাত্মা, এন বি টি, পৃষ্ঠা ১২) তবে এটা উল্লেখযোগ্য যে দলিতদের শিখধর্ম কিংবা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে রবীন্দ্রনাথের নীতিগত সায় ছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতটি মাথায় রেখে পাঠককে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত নিচের দুটি চিঠি পড়তে অনুরোধ করব। উৎস: সব্যসাচী ভট্টাচার্য সম্পাদিত পূর্বোক্ত বইয়ের ২০৩-২০৬ পৃষ্ঠা)

- আশীষ লাহিড়ী

এক

রবীন্দ্রনাথকে লেখা গান্ধীজির সচিব মহাদেব দেশাইয়ের চিঠি

ওয়ার্ধার ঠিকানায়
২০ ডিসেম্বর ১৯৩৬

শ্রদ্ধেয় গুরুদেব,

হরিজনদের শিখধর্ম গ্রহণ প্রসঙ্গে বেশ কিছু লোক নিজেদের সমর্থনে আপনার মত উদ্ধৃত করছে; তারা মনে করে, হিন্দু সংস্কৃতিকে বজায় রেখে হিন্দুধর্ম ত্যাগের একমাত্র পথ হল শিখধর্ম গ্রহণ। এরকম একটা প্রস্তাবে আপনি আদৌ সায় দিতে পারেন, একথা বিশ্বাস করতে পারেননি বাপু। শিখধর্ম যদি হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ হয়, তাহলে হিন্দুধর্ম ত্যাগের প্রশ্নটাই ওঠে না। হিন্দু হয়েও তো শিখ বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করা যেতে পারে, যেমন অনেকে শৈব কিংবা বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাস করে। সেটাকে তো হিন্দুধর্ম ত্যাগ করা বলা যাবে না। যে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করবে, সে হিন্দু সংস্কৃতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুকেই ত্যাগ করবে; কেননা সংস্কৃতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করা যায় না। সংস্কৃতি একজন মানুষের ধর্মেরই প্রতিফলন। আর শিখধর্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যে তা কোনো

ধর্ম কিংবা দর্শন নয়, তা হল হিন্দু আচার-আচরণকে শুধরে নেওয়ার একটা প্রয়াস। কাজেই এদিক থেকে দেখলেও [হিন্দুধর্ম ছেড়ে] শিখধর্ম গ্রহণ করার প্রশ্নটাই ওঠে না।

এর রাজনৈতিক দিকটা নিয়ে আপনাকে বিড়ম্বিত করার কোনো প্রয়োজন আমি দেখছি না। কারণ [হিন্দুধর্ম ছেড়ে] শিখধর্ম গ্রহণ করার ওপর যেভাবে জোর দেওয় হচ্ছে, তাতে এর গায়ে অবধারিতভাবেই একটা রাজনৈতিক রং লাগবে, যেহেতু ধর্মান্তরিতরা ভোট দেবে হিন্দু হিসেবে নয়, শিখ হিসেবে। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাই গোটা ব্যাপারটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এ বিষয়ে যদি আপনার সুচিন্তিত অভিমত লিখে জানান, তাহলে খুব ভালো হয়।

আন্তরিক প্রণাম সহ
আপনার একান্ত
মহাদেবী [যদ্দৃষ্টং:]

পুনশ্চ: আমি এ চিঠি লিখছি ফৈজপুর থেকে। কিন্তু আপনি যদি ২৮ তারিখের পরে এর উত্তর দেন, তাহলে ওয়ার্ধার ঠিকানায় পাঠাতে পারেন । আর যদি তার আগে উত্তর দেন, তাহলে চিঠি পাঠাতে পারেন তিলকনগর, ফৈজপুর-এর ঠিকানায়। এই কংগ্রেসের এবং প্রদর্শনীর প্রতিটি রেখায় আর অঙ্গে নন্দলালবাবুর প্রভাব দর্শনীয়।

দুই

মহাদেব দেশাইয়ের চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতন, বাংলা,
৪ জানুয়ারি [১৯৭৩]

প্রিয় মহাদেও,

[হিন্দুধর্ম ছেড়ে] হরিজনদের শিখ ধর্মগ্রহণের প্রশ্নে আমার মতামত আরো পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করবার জন্য তুমি অনুরোধ করেছ, এতে আমি আশ্চর্য হইনি। গোড়াতেই এই কথাটা জানিয়ে রাখি যে আমি কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ওদের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের পরামর্শ দিইনি; আমি কেবল এই কথা বলেছি যে, ওরা যদি সত্যিই ওরকম কোনো চরম পদক্ষেপের কথা ভাবে, তাহলে শিখধর্ম গ

এহণই প্রশস্ত। আর কেন ওরা ওই চরম পদক্ষেপের কথা ভাবতে পারে, সেটা তো আমরা সবাই জানি। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও আমার একই মত।

দৈনন্দিন ব্যবহারে হিন্দুধর্ম একটা জীবনধারা মাত্র। তার দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ভিত যত মহৎই হোক, শুধু তারই দোহাই দিয়ে হিন্দুধর্মের নামে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক অবিচারের ক্ষালন হয় না। আমাদের ধর্ম সমাজকে নির্দিষ্ট মর্যাদাক্রমে বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে রেখেছে। যারা রয়েছে একেবারে তলায়, তারা একেবারে ন্যূনতন সামাজিক সুবিচারটুকুও পায় না, উপরন্তু নিরন্তর তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তারা মনুষ্যেতর। সনাতনপন্থীরা বলে, এই বিভাজনের মনোভাব, যা আমাদের জনসমাজের এক বিরাট অংশকে অবদমিত করে রেখেছে, সেটি আমাদের ধর্মের স্থায়ী কাঠামোরই অঙ্গ, আর সেটাই আমাদের সমাজের ভিত্তি। মনু, পরাশর প্রমুখ আমাদের সুপ্রাচীন আঞ্জ ইন-প্রণেতাদের অনুশাসন তো তারই প্রমাণ। সনাতনপন্থীরা খুব ভুল বলে না।

আমরা অনেকে ওইসব শাস্ত্রকারদের রচনার উপর সুসভ্যতার চকচকে প্রলেপ লাগানোর চেষ্টা করি। কিন্তু এইসব ব্যক্তিগত ব্যাখ্যান নিপীড়িতদের কোনো কাজে লাগে না, সমাজের স্বৈরতন্ত্রীদের আচরণকেও স্পর্শ করে না। সমাজের স্বৈরতন্ত্রীদের হার মানার কোনো কোনো ঘটনা আধুনিক কালে ঘটেছে, যেমন ঘটেছিল এই সেদিন, চৈতন্যর যুগে। কিন্তু ঠিক তার পরেই মাথা তুলেছিল প্রতিক্রিয়াশীলরা। তাই, আমাদের আধুনিক যুগের অগ্রণী পুরোধা-রা ইতিমধ্যেই যে সামাজিক সংস্কার অর্জন করতে পেরেছেন, তাও যে ভবিষ্যতে চিরস্থায়ী হবে, এমন আশ্বাস নিশ্চিতভাবে দেওয়া যায় না।

ব্যাপারটার রাজনৈতিক দিক নিয়ে আমার বিশেষ কোনো মাথাব্যথা নেই। ওরা হিন্দু হিসেবে ভোট দিল, না শিখ হিসেবে, সেটা আমার কাছে বড়ো কথা নয়; তার চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, আমাদের মনুষ্যত্বকে তা প্রভাবিত করে কিনা, এবং চারপাশের মানুষজনের প্রতি আমাদের একটা মনোভঙ্গি গড়ে তোলে কিনা। অনেক কাল আগে, প্রায় বছর পঁচিশ হল, ... [শিরোনাম অস্পষ্ট][২] কবিতায় আমি ধিক্কার জানিয়েছিলাম সেই সমাজকে যা ভারতের অধিকাংশ মানুষের উপর চাপানো অমর্যাদার ভিত্তিতে আপন সৌধ গড়ে তুলেছে এবং সেই সুবাদে শতশত বছর ধরে আপন পরাজয় আর অধঃপতনের রাস্তা পরিষ্কার করেছে। কিন্তু আমার সে ধিক্কারবাণী ছিল

অরণ্যে রোদন মাত্র। সে ঘোর অরণ্য ঘন ঝাড় বেঁধে মাথা তুলেছে, আর সেই বাড়বৃদ্ধির ইতিহাসে রুদ্ধ করেছে আলো ঢোকার পথ। যে-মহাত্মা আজ আমাদের নেশনের পথপ্রদর্শক, তাঁর পূর্বজ পথপ্রবর্তকদের একের পর এক প্রয়াসকে থামিয়ে দিয়েছে সে-অরণ্য। বাপক জনসাধারণের উপর মহাত্মাজীর যে প্রভাব তা সত্যিই বিপুল, তা সত্যিই আমাদের মধ্যে জাগরণ এনেছে। তবু আমি জানিনা, আরো কত দীর্ঘ অপেক্ষার পর তাঁর শিক্ষা আমাদের মাটির গভীর অন্ধকারে প্রোথিত বিষাক্ত শেকড়গুলির উপর ঠিকমতো কাজ করতে পারবে। অথচ আমরা জানি, অমঙ্গলের কন্টকাকীর্ণ পথে পথে ছড়িয়ে থাকা বিপর্যয় কখনো দিনক্ষণ মেনে আসে না, কবে আমরা তার নিরাময় ঘটাতে পারব, সেই হিসেব করে তো বিপর্যয় আসে না। যে ওষুধ রোগ সারাতে অতিরিক্ত সময় নেয়, প্রায়শ সে ওষুধ ধরবার আগেই রোগীর মৃত্যু হয়।

আমি সত্যিই মনে করি, হিন্দুধর্মের সবচেয়ে দুরারোগ্য একটি সামজিক বিকৃতি, যা আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে হাস্যকর করে তোলে, তাকে ভিতর থকে নির্মূল করার প্রয়াসেই বৌদ্ধধর্ম কিংবা শিখধর্মর উদ্ভব হয়েছিল। গুরু গোবিন্দ একদিন হিন্দু সমাজের বহুযুগ বাহিত প্রথা অমান্য করে, জাতপাতের বেড়া চূর্ণ করে দিয়ে তাঁর অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ভারতের সকল শিখদের জন্য শুধু নয়, তামাম ভারতের জন্যই সেদিনটি এক মহৎ দিন। শিখধর্ম জনগণের কাছে এক সাহসী ব ার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। শিখধর্মের কর্মকৃতির খতিয়ান অতি মহৎ। এই ধর্ম যদি তার ভৌগলিক প্রাদেশিকতা ছেড়ে, ক্ষুদ্র জনসমাজের মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে অবধারিতভাবেই যে-বহির্বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে তার খোলস ছেড়ে, দেশব্যাপী এক পরিপ্রেক্ষিত অর্জন করতে পারে, তাহলে তার ফল যে কত জোরালো হবে তা কে বলতে পারে। তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ আর ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে এমন কিছুই আমি দেখতে পাই না, যা আমার মানবিক মর্যাদাবোধকে আহত করে। আমার পিতা প্রায়শ অমৃতসরের গুরুদ্বারে গিয়ে উপাসনা করতেন, আমি ও তাঁর সঙ্গে রোজ সেখ ানে যেতাম। কিন্তু তিনি কখনো কলকাতার কালীঘাটের মন্দিরে যাচ্ছেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না। অথচ ধর্মে ও সংস্কৃতিতে আমার পিতা ছিলেন হিন্দু। যারা হিন্দুধর্মের বুলি কপচে আচার-আচরণে নিত্য তাকে কলুষিত করে চলে, তাদের অধিকাংশের তুলনায় তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যায় তিনি হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতর মান বজায় রাখতেন। তাই শিখধর্ম কিংবা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে

ওরা যে হিন্দু সংস্কৃতিকে অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করবে, এ ভয় আমার নেই।

নন্দলাল যে আবারও তার মস্ত ক্ষমতার প্রমাণ রেখেছে, তাতে আমি খুব খুশি। ফৈজপুরের বন্দোবস্তকে যে সর্বতোভাবে সার্থক করে তুলবে সে বিষয়ে এতটুকু সংশয় আমার কখনো ছিল না।

সস্নেহ আশীর্বাদ সহ

ভবদীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ফৈজপুর কংগ্রেসে নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রিত প্যানেল ও অন্যান্য সাজসজ্জার কথা বলা হচ্ছে।

২. অনুমান করতে ইচ্ছে হয়, এটি হয়তো 'প্রবাসী' পত্রিকায় জুলাই ১৯১০-এ প্রকাশিত 'অপমান' নামক কবিতাটি যা পরে গীতাঞ্জলির অন্তর্গত হয়:হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান! মানুষের অধিকারে বঞ্চিত রেখেছ যারে, সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'। এর শেষ পঙক্তিগুলি এইরকম: দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে, অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে। সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক, আপনারে বেঁধে রাখ' চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান - মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান'। (গীতাঞ্জলি) রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে পঙ্কজকুমার মল্লিক এটিতে সুর দিয়ে রেকর্ড করেন, যা বহুশ্রুত।

প্রতীত্যসমুৎপাদ

(গড়িয়া বৌদ্ধবিহারে ২৫৪৩ তম বুদ্ধ জয়ন্তীতে আমন্ত্রিত ভাষণ)

গুণধর বর্মণ

[গুণধর বর্মন (৩/২/১৯২৭— ৩/১/২০১৫) কাঁথি মহকুমার গোপালপুর গ্রামে এক অতি দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্য সহ নানা বাধা অতিক্রম করে শ্রী বর্মন সফলভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রের ডিগ্রি অর্জন করেন। দলিত আন্দোলন, বিজ্ঞান আন্দোলনে জড়িয়ে থাকায় এই চিকিৎসা পেশার প্রতি উদাসীন ছিলেন। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে কোনোদিনই সচ্ছলতার মুখ দেখেননি।

চেতনা লহর পত্রিকার তরফ থেকে বেশ কয়েকটি কিস্তিতে তাঁর সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। তিনি যদি আত্মজীবনী লিখতেন তা মনোরঞ্জন ব্যাপারী-এর লেখা *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন* এর তুলনায় কম আকর্ষণীয় হত না। উপরন্তু তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পাথেয় হয়ে থাকত। সাক্ষাৎকার গ্রহণের শেষ পর্বে তাঁর এই প্রতীত্যসমুৎপাদ শীর্ষক ভাষণের মুদ্রিত রূপ দেওয়াতে কেন তাঁর সমচিন্তাবলম্বীরা অনীহ থেকেছেন, এ প্রশ্ন করা হলে বিনয়ী শ্রী বর্মন বলেন— 'সম্ভবত ভাষণটি মানগত ভাবে দুর্বল বলে এবং আমার সহকর্মীরা এ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানী বলেই এ ভাষণ মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়নি।' শ্রী বর্মনকে ঐ সাক্ষাৎকারের শেষ সময়ে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, শ্রী বর্মনের বাল্যকাল থেকে জীবনের সায়াহ্ন পর্যন্ত বিপুলসংখ্যক শুভাকাঙ্খী বন্ধুরা (যারা ঘটনাচক্রে ব্রাহ্মণ কুলজাত) তাঁকে আপদে বিপদে সহায়তা করেছেন অথচ কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি যে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন, সেই পত্রিকার বাকি সদস্যরা ব্রাহ্মণ কুলজাত (মুক্তমনা হলেও) দের অসম্মান করেন। শ্রী বর্মনের প্রায় স্বগতোক্তি ছিল— সম্ভবত ওঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদ নামক ব্যবস্থাটি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয়। ফলে এ ধরনের সংকীর্ণতা আপত্তিজনক হলেও অস্বাভাবিক

নমোতস্স ভগবতো অর্হতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স

পরমশ্রদ্ধেয় ভক্তগণ ও সুধী শ্রোতৃবৃন্দ

আমি প্রথমে বিনম্রভাবে জানাতে চাই মহামানব গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই। বিশেষ করে সামনে যাঁরা উপস্থিত তাঁরা প্রায় সবাই বংশপরম্পরায় 'বুদ্ধভাবাপন্ন' এবং বুদ্ধচর্চায় বিশেষজ্ঞ। তাঁদের কাছে বুদ্ধ বিষয়ে আমি অবোধ বালকতুল্য। কিছু বই পড়েই আমি সেই পূর্ণ-আলোকিত মহামানব সম্পর্কে

সাধ্যমতো জানার চেষ্টা করেছি। তাতে পালি ভাষায় দক্ষতা না থাকায় বুদ্ধকথিত পালি শব্দসমূহের প্রকৃত অর্থ বুঝতে যথেষ্ট অসুবিধাই হয়েছে, আর পালি শব্দের উচ্চারণে ত্রুটি তো আছেই। রিস ডেভিড্‌স ও আনুষঙ্গিক কিছু পালি অভিধান যত্নসহ ঘাঁটাঘাঁটি করেও তা যথাযথ অনুধাবন করতে পেরেছি মনে হয় না। ততোধিক জটিলতা অনুভব করেছি বুদ্ধচর্চায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত-লেখক ও গ্রন্থকারগণের বুদ্ধের জীবনী ও বাণী নিয়ে নানারকম বৈষম্যের বর্ণনায়। সেই সঙ্গে তাঁরা বুদ্ধের 'দেসনা' বা উপদেশগুলিকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে অনেকক্ষেত্রে মূল বক্তব্যকে বিকৃত করে ফেলেছেন বলে মনে হয়েছে। যার ফলে সাধারণ মানুষ বুদ্ধের কথাগুলিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি এবং এখনও পারছে না। আর আমিও তো তাদের মধ্যেই একজন। মোটকথা ঐ বইগুলি পড়ে বুদ্ধের জীবনী ও বাণী সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। পৃথিবীর অন্য কোনো মহাপুরুষের জীবনচরিত নিয়ে এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রকটতা নেই। পৃথিবীব্যপী অসংখ্য বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে যে স্থায়ী অসাম্য ও পারস্পরিক সংঘর্ষ বিদ্যমান তার মূল কারণ তো এইখানেই।

পৃথিবীর নামকরা মহাপুরুষদের জীবনী নিয়ে যাঁরা কিছু চর্চা ও অনুসন্ধানের কাজ করেন তাঁরা সবাই জানেন যে মহান জিশুখৃস্টের জীবনী ও বাণী সাধারণভাবে যা প্রচারিত তার বড় অংশই কাল্পনিক, অসত্য, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অতি বিকৃত। কিন্তু সেইসব মিথ্যা ও বিকৃতির কথা অস্বীকার করে বা সুকৌশলে ধামাচাপা দিয়ে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ খ্রিস্ট-সঙ্ঘ (খ্রিস্টান মিশনারিজ) সর্বত্র জিশু ও তাঁর বাণী সম্পর্কে একইরকম দ্বিধাহীন বক্তব্যে শিক্ষা দেন ও প্রচার করেন। ফলে তাঁদের মিথ্যাটাকে কেউ মিথ্যা বলতে সাহস পান না। যেমন জিশুর জন্ম-তথ্য, তাঁর জন্মের তারিখ, মাস, এমনকি বৎসরটাও যা প্রচার করা হয় বা চলে আসছে তার কোনটাই যে ঠিক নয় সেকথা খ্রিস্টান-মিশনারির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সবাই জানেন (অনুসন্ধানকারীরা তো জানেনই); কিন্তু তা নিয়ে কোনও প্রতিবাদ উঠলে তা অতি রূঢ়ভাবে দমন করা হয়। আর মহামানব বুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্যকে জানা ও জানানোর কোনও চেষ্টা যেমন নেই, তেমনি তাঁর মতবাদ নিয়ে বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলির সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে তোলার আন্তরিকতাও নেই। অতিসম্প্রতি ১৯৯১ সালে দিল্লিতে বিশিষ্ট বুদ্ধানুরাগী কে.পি. আর. বন্ধু-এর চেষ্টায় প্রখ্যাত মবলঙ্কর হল্‌-এ তিনদিনব্যাপী এই বিষয়ে অসাধারণ আলোচনা হয়েছে, বোধহয় সমগ্র এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্ঘ-প্রতিনিধিদের নিয়ে। কিন্তু ঠিক তারপরেই সারা ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রবল হয়ে ওঠায় ঐ মবলঙ্কর হল্‌-এর সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা যাচ্ছে না। এইভাবে নানাদিক থেকেই ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান

নিয়ে তৈরি করা আমার বক্তব্যের দীনতাকে সবাই ক্ষমাসুন্দর মনে গ্রহণ করলে আমি বিশেষ বাধিত হব।

প্রসঙ্গক্রমে যে উদ্দেশ্যে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সেই বক্তব্যে যাওয়ার আগে আমার এক্তিয়ার বহির্ভূত একটি কথা তুলে ধরতে চাই। শাক্যমুনি গৌতম 'ভগবান' বিরোধী ছিলেন। তাই গৌতম বুদ্ধকে ভগবান বলে সম্বোধন করাটা কতখানি সমীচীন? তাঁর জীবদ্দশায় কেউ তাঁকে ভগবান বলে সম্বোধন করত কিনা সঠিক জানা নেই। কিন্তু বুদ্ধকাহিনীতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে (ব্রহ্মনিমন্তিকসুত্ত, - মজ্‌ঝিম-নিকায়-তে) ''বুদ্ধ লাঠি হাতে ঐ 'ভগবান ব্রহ্মা'কে তাড়া করেছিলেন যুক্তিহীন অসত্য কথা বলার জন্য''— একবার নয়, কয়েকবার। সেই কাহিনী দেওয়াল-চিত্র রূপে এদেশে ও বিদেশে বেশ দর্শনীয়ভাবেই আছে। সুতরাং ব্রহ্মা বা ভগবান কখনোই বুদ্ধের সমান হতে পারেন না। অজ্ঞতার সুযোগ সর্বশক্তিমান ভগবান বলে যে অলৌকিক স্রষ্টার কথা ভাবা হয়েছে তা হচ্ছে অন্ধবিশ্বাসের এক অলীক কল্পনা। এখন উন্নত বিজ্ঞানের যুগে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করে তেমন কোনও সর্বশক্তিমান একক স্রষ্টার খোঁজ মেলেনি। ঐ ভগবান কথাটা মানুষেরই তৈরি। বিশ্বের কোনও কিছুই কোনও ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়। আর কল্পিত সেই ভগবান কথার অর্থ হচ্ছে 'ষড়্‌গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি'— যিনি ছয়টি গুণের অধিকারী। কিন্তু গৌতম বুদ্ধকে বলা হয় 'দশবলী', অর্থাৎ দশটি গুণের অধিকারী। তাহলে দুজনে সমান হয় কী করে? ... এতে সবচেয়ে গোলমেলে কথা হচ্ছে ঐ কল্পিত ভগবান বড় অহংকারী ও স্বৈরাচারী। তিনি নিজের খেয়ালখুশি মতো সবকিছু তৈরি করেন, আবার ভেঙেও ফেলেন (ধ্বংস করেন); কোনও নিয়মকানুন মানেন না। মানুষে মানুষে জন্মগত বৈষম্য, তাঁরই সৃষ্টি বলা হয়। তাতে তাঁর খুশিমতো কাউকে (অল্পকিছু পছন্দের লোককে) অঢেল ধনসম্পদ দিয়েছেন; আর বেশিরভাগ মানুষকে করেছেন দুঃসহ দারিদ্র্য-পীড়িত, সারাজীবন নানাকষ্টে জর্জরিত। তাঁরই সৃষ্ট সন্তানদের প্রতি সমতার অনুভূতি নেই কোথাও। তাই তিনি সর্বমানবের কল্যাণকামী নন। তাঁরই স্বেচ্ছাচারিতায় মানুষে মানুষে স্থায়ী ভেদাভেদের বিদ্বেষ এবং হিংস্র রেষারেষি চলেছে যুগে যুগে। সুতরাং সুস্থ মানবতার দৃষ্টিতে ঐ ভগবান হচ্ছে একান্ত নিন্দনীয় ব্যক্তি এবং জঘন্যভাবে ঘৃণার্হ। অন্যদিকে বাস্তব জগতের মহামানব গৌতম বুদ্ধ হচ্ছেন শুধু মানুষের নয়, সর্বজীবেরই কল্যাণকারী। সব মানবে সমতা, মমতা ও পরম ভ্রাতৃত্বের কথাই তিনি প্রচার করে গেছেন। এই মহাজ্ঞানী বুদ্ধকে অজ্ঞতা যুগের কুটিল চরিত্রের ভগবান-এর সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। তবু অজ্ঞাত সংস্কারবশেই বৌদ্ধসঙ্ঘসমূহে ভগবান বুদ্ধ কথার ব্যবহার চলেছে এবং সাধারণভাবে 'বুদ্ধ-দেব' কথা ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সংস্কার (সঙ্‌খার) বদলানো দরকার। বৌদ্ধশাস্ত্র তো বলে সব সংস্কারই অনিত্য ও

দুঃখজনক। 'সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা'— 'সব্বে সঙ্খারা দুক্খাতি। সেই কথা মানলে এতদিনের অভ্যস্ত সংস্কার— ঐ 'ভগবান বুদ্ধ' কথার ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করতে হয় এবং বুদ্ধদেব বলাও চলে না। পরিবর্তে তথাগত বা অনুরূপ মহত্ত্বপূর্ণ একটি শব্দ ব্যবহার করতে হয় এবং সেটাই বৌদ্ধদর্শনের (প্রতীত্যসমুৎপাদের) নির্দেশ।

সেই 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' কথায় এবার আসা যাক। এই কথাটি বুদ্ধের নিজস্ব সৃজন। তাঁর আগে ভারতীয় ভাষায় এই কথা ছিল না। বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানচর্চা (A'nalytical discussion)-য় এটি এক অসাধারণ দিগ্‌দর্শন। এই পৃথিবীতে শুদ্ধযুক্তি'তে জ্ঞানের চর্চা অর্থাৎ বিজ্ঞানচর্চার আদি পথিকৃৎ হচ্ছেন গৌতম বুদ্ধ। তাই তাঁকে বিজ্ঞানমাতৃক বলা হয়। প্রকৃত বিজ্ঞানচেতনার তিনিই জনক। তাঁর বক্তব্য ও 'ধর্ম-দেসনায়' সাধারণের উপযোগী করে অসাধারণ বিজ্ঞানের কথাই তিনি বলে গেছেন। তাতে যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের স্থান নেই। মানুষের দুঃখের কারণগুলি যথাযথ বিশ্লেষণ করে যুক্তি দিয়ে সেই দুঃখ নিরোধের উপায়গুলি তিনি যেভাবে বলে গেছেন তাই হচ্ছে বৌদ্ধ 'ধর্ম ও দর্শন'। এই ধর্ম-য় কোনও অলৌকিক শক্তির দেবতা বা ভগবানের পূজা-অর্চনার কথা নেই। সমাজকে ও ব্যক্তিমানুষকে যা সুস্থভাবে ধরে রাখতে পারে তেমন ব্যবস্থাকেই ধর্ম (ধম্ম) বলা হয়েছে। আর 'দর্শন' কথা তো মনেরই ব্যাপার, সাধারণ চক্ষু দিয়ে দেখা নয়। সত্যনিষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টিতে একাগ্র সাধনায় যা দেখা যায় তাই হচ্ছে দর্শন। এই মন বিষয়টা অবশ্যই জটিল। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে সেই জটিলতার সমাধান আজও হয়নি। কী বস্তু এই মন? কোথায় তার উৎপত্তি, কোথায় বা তার স্থিতি? কীভাবে তা কাজ করে? কী অকল্পনীয় তার গতি! এই কথাগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা-সংজ্ঞা ও রূপরেখা দেওয়া এবং তা বুঝে নেওয়া সহজ নয়। সেই মনের শক্তি-বৈচিত্র্যও যে অসাধারণ তাও প্রমাণিত। তবু তার (মনের) 'স্বতন্ত্র অস্তিত্ব' নাই, 'সুস্থিত-সত্তা'ও নেই। প্রতিক্ষণে অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল এই 'মন'। সেই মন ও 'মনন-ক্রিয়া' বিষয়ে সুদূর অতীতে প্রখর মনশ্চক্ষুর সাহায্যে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ যে অসামান্য 'স্বত্ত্বাশক্তি'র (Intuition-এর) পরিচয় দিয়েছেন তা অতীব বিস্ময়কর। আধুনিক যুগের উন্নত-বিজ্ঞান ঐ ক্ষেত্রের কাজে এখনও হিমশিম খাচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত বিজ্ঞানতথ্যের অংশ হিসেবে 'জীবন ও জগৎ' সম্পর্কে সর্বাধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে, এই পৃথিবী নামক অতি নগণ্য গ্রহটি ছাড়া মহাবিশ্বের অন্য কোথাও মানুষ-জাতীয় 'বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন' জীবের অস্তিত্ব নাই। এমনকি 'প্রাথমিক জীবসত্তা'র (প্রোটোপ্লাজম্-এর) উপস্থিতিও অসম্ভব। কারণ অনন্তবিশ্বের কোনখানেই জীবনসৃষ্টির পরিমণ্ডল নাই। এতে সর্বশক্তিমান 'ভগবান'

কথাটা যে একান্তই কাল্পনিক তাই প্রমাণিত হয়। সর্বশক্তিমান হয়েও সেই মহান স্রষ্টা ইচ্ছামতো যেখানে সেখানে জীবন সৃষ্টি করতে পারেননি কেন? তা হল অজ্ঞতা যুগের কল্পিত 'স্বর্গলোক', 'দেবলোক', 'বৈকুণ্ঠ-গোলোক', 'ব্রহ্মলোক' এবং সাধারণে কথিত 'পরলোক' কথা সবই অলীক কল্পনা।

বিশ্বজুড়ে এই ভয়াবহ (জীবনহীন) পরিবেশের কথা জানা গেছে মাত্র শ'খানেক বৎসরের মধ্যেই। বহির্বিশ্বে এই ভয়ঙ্কর জীবনবিরোধী পরিবেশ সম্পর্কে পৃথিবীর বৃহত্তর বুদ্ধিজীবীমহল এখনও যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে মোটেই ভাবছেন না। এখনও তাঁরা সুদূর অতীতের 'বিচারবুদ্ধিহীন' হিংস্র প্রাণীদের মতোই ক্ষুদ্র স্বার্থের হীন সংঘর্ষে মেতেই রয়েছেন,– তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির সবটাই যেন মশগুল হয়ে রয়েছে সেই অজ্ঞতা যুগের অলীক কল্পনায়। হায় বুদ্ধিমান মানুষ! বলিহারি তোমার বুদ্ধিবৃত্তির বিশ্লেষণী ক্ষমতায়!!

বিজ্ঞানচর্চার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলেই আজ আমরা জেনেছি যে এই পৃথিবীতে 'জীবনের উদ্ভব' (origin of life) ঘটেছে একান্ত আকস্মিক ভাবেই। বিশ্ব প্রকৃতিকে (The nature as a systematic whole =The Cosmos-কে) তুলনা করা যেতে পারে এক অতি বিশাল (বিশ্বব্যাপী) গবেষণাগারের (ল্যাবরেটরি)-র সঙ্গে। সেখানে প্রাকৃতিক নিয়মে মহাজাগতিক ভৌত উপাদান (elements) সমূহে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে ধারাবাহিক মিলন-মিশ্রণ, সংযোজন-বিয়োজন প্রক্রিয়ার এক বিশেষ পর্যায়ে হঠাৎ উৎপন্ন হয়েছে 'আদি জীবসত্তা'। তার বিশদ আলোচনা তো এখানে সম্ভব নয়। তবে এটা সুনিশ্চিত যে ঐ ঘটনা কোনও 'খেয়ালি স্রষ্টা'র হঠাৎ ইচ্ছায় নয়। প্রচলিত ধর্মীয় দর্শনে বর্ণিত সর্বশক্তিমান 'অলৌকিক স্রষ্টা'র ইচ্ছায় জীবসৃষ্টি হলে তা ঘটতে কোটি কোটি কোটি বৎসর সময় লাগবে কেন? মোটামুটি শিক্ষিত সবাই এখন জানেন, আদিম পৃথিবী ছিল অতি উত্তপ্ত আগ্নেয়-গোলক একটি– সূর্যের সমান 'তাপধারিণী'। কোনো জীবন যেখানে থাকতে পারে না। লক্ষকোটি বৎসর তাপ বিকিরণ করে সেই অগ্নিগোলক শীতল হয়ে উপরে বর্ণিত 'প্রাকৃতিক নিয়মে' হঠাৎ এক সময়ে তার শীতল বুকে পেয়েছে 'আদি জীব-সত্তা'কে। তারপর সেই 'জীবন'কে টিকিয়ে রাখা যে কী কষ্টকর কাজ – তার ইতিহাস আরও রহস্যঘন।

আদিম জীবসত্তা বিশেষ আকার নিয়ে (প্রোটোপ্লাজম-রূপে) পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর তার ক্রমবিবর্তন (ইভোলিউশন) আরও কঠিন ও জটিল ব্যাপার। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে জীবনের ক্রম 'অভিব্যক্তি'– (Evolution precess)-ই আসল জীবন সংগ্রাম (struggle for existence)। বাঁচার জন্য ব্যক্তিগত লড়াইটা বৈজ্ঞানিক জীবন সংগ্রাম নয়। এই বৈজ্ঞানিক জীবনসংগ্রামের তথ্য পরিষ্কারভাবে জানা গেছে মাত্র কয়েক

দশক আগে। অথচ সুদূর অতীতে মহাজ্ঞানী গৌতম তাঁর অসাধারণ মননক্রিয়ায় এই বৈজ্ঞানিক তথ্যকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করেই অনুমান করেছেন! তাই তো তাঁকে 'পূর্ণ আলোকিত' যথার্থ জ্ঞানপ্রাপ্ত (The Enlightened) বলা হয়। তাঁর সমকালীন অন্য কোনও মনীষী (মুনিঋষিগণে'র কেউই) সেই বৈজ্ঞানিক তথ্যের ধারেকাছেও যেতেই পারেননি। তাঁরা সবাই জীবের জন্মসহ বিশ্বপ্রকৃতির অধিকাংশ ঘটনাকেই দুর্বোধ্য ভেবেছেন এবং যুক্তি দিয়ে সেসবের ব্যাখ্যা করতে না পেরে নিয়তি নামে আর একটি কাল্পনিক তত্ত্ব খাড়া করেছেন। সেই নিয়তিকে তাঁরা বলেছেন বিধাতার বিধান বা অবশ্যম্ভাবী ভাগ্য। এইভাবে দুর্বোধ্য সবকিছুকে কল্পিত ভগবান-এর সঙ্গে যুক্ত করে ভাগ্যবাদ বা অদৃষ্ট কথার প্রচলন (অদৃষ্ট মানে যা দেখা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না)। অপরপক্ষে মহান বুদ্ধ সেই অদৃষ্ট নিয়তিকে মানেননি (ভগবানকে তো নয়ই)। তাঁর অসামান্য স্বজ্ঞা-শক্তি (Intution)তে গৌতম বুদ্ধ নিয়তিকে অস্বীকার করে জটিল তত্ত্বের সবকিছুকে কার্য-কারণ সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন এবং সেইভাবেই মানুষের দুঃখ নিরোধ-এর কথা বলেছেন, তার পথও দেখিয়েছেন। প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের জন্ম-বার্ধক্য-জরা-মৃত্যু— স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহ। এসব দুঃখজনক হলেও অপরিহার্য সত্য (আর্যসত্য), যার থেকে পরিত্রাণের উপায় কারও নেই।

উক্ত বিষয়ে বুদ্ধের বক্তব্য— জন্ম-দুঃখ, বার্ধক্য-দুঃখ, মরণ-শোক প্রভৃতিতে উত্ত্যক্ত হওয়াও দুঃখ। প্রিয়-বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ, কাম্যবস্তুর অপ্রাপ্তি— দুঃখেরই ব্যাপার। সংক্ষেপে বুদ্ধের ভাষায় 'পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ'ই দুঃখ। সেই উপাদানগুলি হচ্ছে —

১. রূপ: ভৌত উপাদান = মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট উপাদান।

২. বেদনা: অনুভূতি = বস্তু সম্পর্কে ভালো-মন্দ বা সুখ-দুঃখের অনুভূতি।

৩. সংজ্ঞা: ধারণা = বিভিন্ন অনুভূতিতে মস্তিষ্কে যে ধারণার সৃষ্টি হয়, যা দিয়ে বস্তু ও ঘটনাকে চেনা যায় বা স্মরণ করা যায় তাই হচ্ছে সংজ্ঞা।

৪. সংস্কার: মানসিক ছাপ = উপরের রূপ, বেদনা ও সংজ্ঞার প্রভাবে মনোজগতে যে ছাপ পড়ে, তার অনেকগুলি সহজে মুছে যেতে চায় না। সেই অল্পবিস্তর স্থায়ী মনের ছাপকে বলে সংস্কার (সঙ্খার)।

৫. বিজ্ঞান: চেতনা = ব্যক্তিমনের যে অবস্থাটা আমি ভাব বা অহংবোধ অর্থাৎ আমিত্ব বোঝায় তাকে বিজ্ঞান বলা হয়েছে। আত্ম-সচেতনতা (Self Awareness)। এরই অপর নাম আত্মা, (আত্মা-বিরোধী বুদ্ধ আত্ম-চেতনাকে বিজ্ঞান নাম দিয়েছেন)।

এই পঞ্চ-উপাদানযুক্ত দুঃখসমূহকে দূর করতে হলে আগে তার মূল কারণ স্থির

করতে হবে। তারই নাম দুঃখ-হেতু (দুঃখের কারণ)।

দুঃখ-হেতু

দুঃখের হেতু কী? সহজ উত্তর আসক্তি বা তৃষ্ণা। দুনিয়ায় যতরকম ইন্দ্রিয়প্রিয় বস্তু ও বিষয় আছে সে সম্পর্কে চিন্তা ও তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনই হচ্ছে আসক্তি বা তৃষ্ণা (পালিতে— তণ্হা)। তৃষ্ণার তিনটি ভাগ— ভবতৃষ্ণা, বৈভবতৃষ্ণা ও সম্ভোগতৃষ্ণা। ভব কথার অর্থ সংসার। সংসারে আসক্তিই ভবতৃষ্ণা। আবার জীবনের অস্তিত্বকেও ভব বলা হয়। সেই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই বা অস্থির হওয়াটা ভবতৃষ্ণা।

আর বৈভব মানে ধনসম্পত্তি। তাতে প্রভুত্ব জারি করাই বৈভবতৃষ্ণা। সম্ভোগ মানে উপভোগ। খাদ্যবস্তুর রসাস্বাদন, সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ, যৌনক্রিয়া— এইগুলি সম্ভোগের বিষয়। সবরকম বিলাসিতাই সম্ভোগের কথা। বিলাসব্যসন থেকেই চিত্তবিক্ষেপ ঘটে।

কাম্যবস্তুর ভোগলালসা থেকেই রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক বাঁধে (প্রভুত্ব জারির জন্য) বৈশ্যে বৈশ্যে হানাহানি হয় (ব্যাবসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়), পিতাপুত্রে মনোমালিন্য ঘটে, মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নী-বন্ধুদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। সর্বক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ আসক্তি বা তৃষ্ণাই যাবতীয় দুঃখের কারণ (=হেতু)। সেই দুঃখের বিনাশ কীভাবে সম্ভব?

দুঃখবিনাশ

দুঃখ-নিরোধ'ই বুদ্ধের সমুদয় দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। তৃষ্ণাই যখন দুঃখের কারণ তখন তৃষ্ণাদমন করলেই দুঃখের বিনাশ হবে। কিন্তু বাস্তবে কাজটা মোটেই সহজ নয়। বুদ্ধের অনেক আগের মনীষীরা ভোগ-লালসাকে সংযত করে সংসারে সুখ-শান্তির উপদেশ দিয়েছেন। তার একদিকের পথে বলা আছে কৃচ্ছ্রসাধনের কথা, নানারকম জপতপ, ব্রত, হোম-যজ্ঞাদির মাধ্যমে বাসনাকে সংযত করার নির্দেশ। অন্যদিকে কল্পিত দেবতা বা ভগবানের কাছে নিজেকে পূর্ণ সমর্পিত করে সেই দেবতার দয়ায় নিজের সুখ-শান্তির আশা অর্থাৎ ভক্তিমার্গে বিশ্বাস (বিধাতার বিধান বা নিয়তিকে মেনে চলা)। কিন্তু এই দুই মার্গের (পথের) কোনওটাই ফলপ্রসূ হয়নি। কৃচ্ছ্রসাধনে প্রখর তপস্বীর চিত্তসংযমে অসমর্থ হওয়ার নজরই বেশি। বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিগণের কেউ কাম-ক্রোধকে সম্পূর্ণ জয় করেছেন এমন উদাহরণ নাই। কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে তাঁরা ক্রোধ-রিপুকে জয় করতেই পারেননি। যখন তখন আবেগে অধীর হয়ে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়াই অনেককে অভিসম্পাত করেছেন নিছক ক্রোধের বশেই। একইভাবে শ্রেষ্ঠ মুনিদের

অস্বাভাবিক কামাসক্তির উদাহরণ মোটেই কম নয়। কৃচ্ছ্রসাধনে কামরিপু বশীভূত হয় না— সেই কথা প্রমাণিত। সেইসঙ্গে তাঁদের উপাস্য দেবচরিতেরও একইরকম উচ্ছৃঙ্খলতার নজিরই বেশি।

অন্যদিকে ভক্তিমার্গে নিয়তিকে প্রাধান্য দিয়ে সংগঠিত সমাজে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টা বা পৌরুষকে তুচ্ছ করা হয়েছে। তাতে বৃহত্তর জনগণের কর্মোদ্যম ব্যাহত হয়েছে। ফলে সংসারে মাত্রাতীতভাবে অভাব-দুঃখই বেড়েছে। অধিকাংশ মানুষই শান্তি-সুখের সন্ধান পায়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধপূর্ব মুনিঋষিগণ ভোগবাদী তৃষ্ণা দমনের সঠিক পথনির্দেশ দিতে পারেন নি। তাই ভগবানরূপী রাজা রামচন্দ্র, দ্বারাকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, ধর্মাবতার নামে কথিত যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ব্যক্তিচরিত্রে কী নিদারুণ অশান্তি ও মর্মান্তিক দুঃখেরই সমাবেশ। তাঁদের পরিবারের কেউই চরম যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাননি। সমগ্র দেশকেই তাঁরা ভয়াবহ দুর্দশার পথে ঠেলে দিয়েছেন তাঁদের জীবদ্দশাতে ও অনুবর্তীকালে। আর ঐ দুঃখদুর্ভোগের সবকিছুকে তাঁরা নিয়তি বলে অপব্যাখ্যা করে গেছেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তো সশরীরে স্বর্গে গিয়েও নরকযন্ত্রণা এড়াতে পারেননি। তাঁকে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে প্রত্যক্ষ নরকদর্শন করে একটিমাত্র মিথ্যাকথা বলার জন্য (অশ্বত্থামা হত-ইতি গজ) এই ছলনার শাস্তিভোগ স্বরূপ।

সুতরাং 'তৃষ্ণা-দমন' সহজ ব্যাপার নয়। আর সেই তৃষ্ণা-জনিত দুঃখ ও শাস্তি সবাইকে পেতেই হয়। মহাজ্ঞানী গৌতম বুদ্ধ ব্যক্তিগত জীবনে ভোগসুখের সবরকম সুযোগই পেয়েছিলেন। সেই সুযোগের সবগুলি পরীক্ষা করে শান্তি খুঁজে পাননি। তাই শেষে মজ্ঝিম মগ্‌গ (প্রতিপাদ্য) মধ্যপন্থা গ্রহণের নির্দেশই দিয়ে গেছেন তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের পরে। বুদ্ধপ্রদর্শিত সেই সর্বব্যাপী অহিংস পথেই সমাজে রাষ্ট্রে প্রভূত সমৃদ্ধি ঘটেছিল। বুদ্ধের পরবর্তী সহস্রাধিক বৎসরকাল (প্রায় ১২ শত বৎসর) সেই পথ অনুসরণ করে ভারতবর্ষ সর্ববিধ সমৃদ্ধির চরম শিখরে উঠেছিল। ভারতের যা কিছু গৌরব ও উন্নতির কথা তার সবই ঐ সময়কালেই ঘটেছে যথাসম্ভব বুদ্ধনীতি মেনে চলার ফলেই। তারপরে বুদ্ধের পথ পরিহার করে অবধারিত ধ্বংস ও অশান্তির মধ্যে ডুবেছে ভারত। আর সেই অবস্থা চলেছে আজ তক্‌।

"তৃষ্ণা" দমন ও দুঃখ নিরোধের উপায়:

'তৃষ্ণা'কে প্রাথমিকভাবে সংযত করে ক্রমান্বয়ে তার পূর্ণবিলোপ সম্ভব। তাতেই 'দুঃখ -নিরোধ' হবে – সেইটাই বুদ্ধের শিক্ষা। বুদ্ধ প্রবর্তিত 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'-ই বিক্ষিপ্ত

চিত্তকে সংযত করতে পারে। সেই আটটি উপদেশকে কীভাবে পালন করতে হবে– তাই হচ্ছে বুদ্ধের হাতে-কলমে শিক্ষা, (Practical training)। দুঃখ মানে অসুস্থতা, তাকে দূর করার জন্য চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়। শুধু বই পড়ে আর উপদেশ শুনে তো যথার্থ চিকিৎসক হওয়া যায় না। তার জন্য হাতে কলমে অনেক কিছু শিখ তে হয় এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে সবকিছু অনুধাবন করতে হয়। সেই নিষ্ঠার অভাব হলে কেউ ভালো চিকিৎসক হতে পারে না, বুদ্ধ যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সেই 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' শিক্ষার প্রচলন করে গেছেন। তার খুঁটিনাটি আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি সেই শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। 'শীল', 'সমাধি', 'প্রজ্ঞা'– সেই জ্ঞান-সাধনার তিনটি স্তর।

১। শীল– সদাচার বা নৈতিক বিধিপালন।

অবিচলিতভাবে এই শীল ধর্ম পালনই সমগ্র জ্ঞানসাধনার মূল ভিত্তি। এর মধ্যে ''পঞ্চনীতি'', অষ্টনীতি, নব-নীতি, দশনীতি, 'আজীবকট্ঠমক' শীল ও চতুপারিসুদ্ধি'' শীল– এই ছয়প্রকার শীলধর্মের কথা আছে, যার সবগুলি সর্বসাধারণের জন্য নয়। সাধারণের জন্য 'পঞ্চশীল'ই বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য। বাকিগুলি মূলত শ্রমণ ভিকখুদের জন্য।

২। সমাধি = যোগ বা মনঃসংযোগ, নৈতিক বিধিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চিত্তের একাগ্রতা স্থাপনই এখানে মুখ্য লক্ষ্য। যাতে মানসিক চাঞ্চল্য দূর হয়, তার জন্য অবিচলিতভাবে একটি বিশেষ বিষয়ে মনকে নিযুক্ত রাখা বা ধ্যান করার নামই ''সমাধি''। এতে অবশ্য চল্লিশ রকমের পদ্ধতি আছে এবং তাদের সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সেগুলি প্রকৃতপক্ষে 'প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিং' ছাড়া আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

৩। প্রজ্ঞা– (প্র+জ্ঞান)=প্রঞ্ঞা। সাধারণ অর্থ 'প্রকৃত জ্ঞান'

অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষস্তরে এই আলোচনা আনা হলেও 'প্রজ্ঞা'ই বৌদ্ধধর্মের আসল কথা এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'প্রজ্ঞা' অর্জন করতে না পারলে বৌদ্ধনীতির মূল লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

'প্রজ্ঞা'তে– দুটি কথা (ক) সম্যক দৃষ্টি বা 'সঠিক দৃষ্টি', আর (খ) সম্যক সংকল্প এই দুই মিলেই 'সম্যকজ্ঞান' = প্রজ্ঞা। সংকল্পকে যথাযথ কার্যকরাই সম্যক সংকল্প। এতে সঠিক দৃষ্টিটাই বৌদ্ধ দর্শন। (দৃষ্টি = দর্শন)। তবে এই দৃষ্টির মধ্যে অসাধারণ বিজ্ঞানচেতনা রয়েছে। সেইটা না জানলে অনিত্য ও অনাত্মা কথাদুটি কোনওমতে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এটাই প্রতীত্যসমুৎপাদ-এর মূল কথা।

তৎকালীন সমাজে নানাভাবে ভোগ-লালসার প্রাবল্য ছিল। তার সবটা তৎক্ষণাৎ

উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিল না। এই ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌পট মনে রেখেই যাবতীয় সংস্কার কাজে গৌতম বুদ্ধকে হাত দিতে হয়েছে।

তখন রাজায় রাজায় 'ভোগবাদী' যুদ্ধ ছিল। সামন্তেরা আঞ্চলিক প্রাধান্য বিস্তারে মত্ত ছিল। ব্যবসায়ী শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে নানারকমের হীন প্রতিযোগিতা ছিল। প্রজাসাধারণের মধ্যেও ব্যক্তিস্বার্থের কুটিলতা কম ছিল না। স্বার্থদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সেই সমাজে বুদ্ধের অহিংসাবাণী বৃহত্তর সমাজে কিছু আশার সঞ্চার করেছিল। সমাজকে ভোগশূন্য করার চরম লক্ষ্য রেখেই ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্নজনকে ভোগতৃষ্ণার বিষময় পরিণতি বুঝিয়েছিলেন বুদ্ধ। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিমাত্র বুদ্ধের বাণীকে অন্তরে উপলব্ধি করেছিল এবং তৃষ্ণাদমনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এইদিক থেকে বুদ্ধ ছিলেন কালোপযোগী শ্রেষ্ঠ প্রয়োগবাদী (pragmatist) । কাঁটার আঘাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছাদিত না করে, জনে জনে ব্যক্তিগত পা-দুখানিকে আবৃত করাই শ্রেয় এবং সংগত। সেইভাবে ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও অতিরিক্ত 'বিষয়-তৃষ্ণা'কে সংযত করে বৃহত্তর সমাজে সাম্য-মৈত্রী-করুণার ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন গৌতম বুদ্ধ। সেই তত্ত্ব কথাই প্রতীত্যসমুৎপাদ।

প্রতীত্যসমুৎপাদে আছে তিনটি মূল কথা:- অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম। আগের পণ্ডিতগণ আমি বলতে এক স্থায়ী আত্মার কল্পনা করেছিলেন, যার বিনাশ নেই। কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদে মহাবিশ্বের সবই অনিত্য ধরে নিলে চিরস্থায়ী আত্মার কথা লোপ পায়। অনিত্য কথার প্রকৃত অর্থ ক্ষণস্থায়ী। সেইভাবে প্রিয়বস্তুর ক্ষণস্থায়িত্বের জন্যই জীব দুঃখাভিভূত হয়। বস্তু ও বিষয়ের ক্ষণস্থায়িত্ব ও অনিত্যতাই দুঃখবোধের কারণ। ঐ অনিত্য-সূত্র অনুসারে নিত্য-আত্মা নামে কোনও শাশ্বত সত্তার কথা ভাবা ও মানা যায় না। এরই নাম অনাত্মবাদ। এইভাবে অনিত্য-দুঃখ অনাত্মা কথার সৃষ্টি। বুদ্ধ সেই কথাকে সাধারণের বোধগম্য করে এইভাবে বলেছেন: ''ইমস্মিন সতি ইদং হোতি, ইমস্সুপ্‌পাদা ইদং উপ্‌পজ্‌জতি''। অর্থাৎ এইরূপ কারণ থাকলে এইরকম ঘটনা ঘটে, সেই কারণের উৎপত্তিতেই ইহা উৎপন্ন হয়। এতে প্রত্যেক উৎপাদকের কোনও না কোনও কারণ আছে, এই প্রত্যয় (বিশ্বাস) হয়। এখানে প্রত্যয় মানে বিশ্বাসযোগ্য হেতু (কারণ)। তাই সামগ্রিকভাবে বুদ্ধের এই মতবাদকে 'হেতুবাদ' বলা হয়।

কার্য-কারণ সম্পর্কিত এই ধরনের আলোচনা বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। বৈদিক যুগেও তা ছিল। বুদ্ধ সেইখানে একটি বৈশিষ্ট্য এনেছেন। তা হচ্ছে, এক-একটি কারণের উৎপত্তি হয় বিচ্ছিন্নভাবে, ধারাবাহিক বিনাশশীলতার মাধ্যমে। একের বিনাশের পর অন্যের উৎপত্তি হয়। অতীত বস্তু বিনষ্ট হয়ে নূতনের সৃষ্টি হয়। এই

নূতন উৎপন্ন হওয়ার পূর্বক্ষণে অতীত বস্তুর পূর্ণ বিলুপ্তির ধারণাটা আগে ছিল না। এইটাই বুদ্ধের অবদান। ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ায় এই নূতন-সৃষ্টি ব্যাপারটি পরবর্তীকালের তর্কশাস্ত্রে ও ন্যায়শাস্ত্রে 'দ্বান্দ্বিক বিকাশতত্ত্ব' নামে পরিচিত। ইংরাজিতে তাকে বলে ডায়ালেক্‌টিসিজম। এই প্রক্রিয়ায় আলোচনার জন্য প্রথমে কোনও একটি বিষয় নেওয়া হয়। তাকে বলা হয় থিসিস। সেই থিসিসের বিরুদ্ধে কী কী বক্তব্য হতে পারে তা ভাবা হয় বা খাড়া করানো হয়। সেগুলিকে বলে প্রতিবাদী বিষয় বা অ্যান্টি থিসিস। এইভাবে উপযুক্ত যুক্তিবাদী ধারায় নূতন সৃষ্টি বা সিন্থেসিস-এর কথা বলা হয়। বর্তমান পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানানুসন্ধানে এই ডায়ালেক্‌টিক্ প্রক্রিয়া অত্যাবশ্যক বলে স্বীকৃত। আধুনিক দর্শন চর্চায় এই প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ফ্রেইঙ্গ্ ড্‌রিখ ভিলহেল্‌ম্ হেগেল (১৭৭৮-১৮৩১) তাঁর ইউনিভার্সাল ফিলসফি — তত্ত্বের আলোচনায়। কিছু পরে ১৮৪৭-এ হেগেলের ঐ দার্শনিক তত্ত্বকে অবলম্বন করেই কার্ল মার্কস ও ফ্রেইডরিখ এঙ্গেলস আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজ্‌ম্ নাম দিয়ে। এইভাবে আধুনিক দর্শনতত্ত্বে ডায়ালেক্‌টিসিজ্‌ম্ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে অথচ গৌতম বুদ্ধই যে এই বিশিষ্ট তত্ত্বের উদ্ভাবক সেই কথা সাধারণ আলোচনায় প্রাধান্য পায় না। পরন্তু গৌতমবুদ্ধকে ধর্মীয় গুরু হিসাবে দেখে পাশ্চাত্যাভিমানীরা মননশীলতার ক্ষেত্রে বুদ্ধের ঐ অসাধারণ অবদানকে ভাববাদী কল্পনারূপেই অবহেলার চোখে দেখেন। এইখানে বিশেষ স্মরণীয় যে, হেগেল ছিলেন পরমসত্ত্বা ভগবানে বিশ্বাসী। আর ধর্মীয় গুরু হয়েও বুদ্ধ ছিলেন ঘোরতর ভগবান বিরোধী। মানুষের দুঃখভোগের কারণ বিশ্লেষণ করে সেই দুঃখ-নিরোধের সক্রিয় পথনির্দেশ হিসাবে বুদ্ধ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেই হেতুবাদ প্রচলন করে গেছেন। সেই হেতুবাদের প্রতীত্যসমুৎপাদে কোনও অন্ধবিশ্বাসের কল্পনা নেই এবং কোনও ভাববাদী অবস্‌কিউর‍্যান্টিজ্‌ম্-এর স্থানও নেই। সুদূর অতীতের সেই অন্ধবিশ্বাসের যুগে বুদ্ধের মতো এত উন্নত প্রগতিশীল চিন্তাবিদ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেউ আছেন কি? এই মহান সত্যটি যথার্থ উপলব্ধি করেছেন বিশ্বখ্যাত জীবনবিজ্ঞানী থিওডোসিয়াস ডব্‌ঝাঁসকি (Theodosius Dobjhansk)। তিনি তাঁর ১৯৭৬-এ প্রকাশিত প্রখ্যাত প্রবন্ধগুচ্ছে **The Evolution of Mankind** মানব ইতিহাসের প্রগতি সম্পর্কে আলোচনায় বুদ্ধের অবদানকে সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। অন্য কোনও বিজ্ঞানী এতখানি গুরুত্ব দিয়ে বুদ্ধের কথা লিখে যাননি। প্রতীত্যসমুৎপাদের সেই কালজয়ী মতবাদ সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানোন্নত দেশে তাই এখন বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আর হেগেলীয় পরমসত্তার কল্পনা অল্পকাল মধ্যেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, তাঁরই অনুগামী মার্কস-এঙ্গেলস্ দ্বারাই। মার্কসবাদ যে পরমসত্তা

ঈশ্বর তত্ত্বের বিরোধী একথা এখন সবাই জানেন। তবে এদেশের কয়জন মার্কসিস্ট তা মানেন জানি না।

দর্শনতত্ত্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উন্নত ধারা সংযোজনের মতোই বিজ্ঞানমাতৃক বুদ্ধ বিজ্ঞান চিন্তাতেও স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন ঐ প্রতীত্যসমুৎপাদেই। তা হচ্ছে ঐ বিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহ তত্ত্ব, Discontinuous Continuity-র কথা। বুদ্ধের আগে কার্যকারণ ধারায় ক্রমান্বয়ী ঘটনাগুলিকে একটানা নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারা বলে ভাবা হত। তাতে যে বিজ্ঞানসম্মত বিভ্রান্তি রয়েছে সেকথা বুদ্ধই আরও গুরুত্ব দিয়ে বলে গেছেন।

ব্যাপারটি যথাযথ উপলব্ধির জন্য উদাহরণ প্রয়োজন। যেমন, জলস্রোত— একটি প্রবাহ— বিরামহীন গতি। আপাতদৃষ্টিতে তাকে অবিচ্ছিন্ন ধারা বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে তা হচ্ছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অসংখ্য জলকণার সম্মিলিত প্রবাহ। যেন মিছিল। মানুষের গতিশীল দীর্ঘ মিছিলকে জনস্রোত বলা হয়। ঠিক তেমনি জলকণারা দলবেঁধে ঐ জলস্রোতের মিছিলে রয়েছে। তারা ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের গায়ে লেগে থাকার জন্যই অবিচ্ছিন্ন মনে হয়। এইখানেই আপাত সত্য ও বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকৃত তফাৎ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রকৃতিরাজ্যের সেই সহজ সত্যকে যথাযথ বুঝে নিতে না পারলে প্রতীত্যসমুৎপাদের অনেক কিছুই হৃদয়ঙ্গম হবে না।

বিজ্ঞান গবেষণায় এই বিচ্ছিন্ন প্রবাহ ব্যাপারটা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করতে বুদ্ধের পরে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর সময় লেগেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে আলোক ও তাপের শক্তিকণা সমূহের বিচ্ছিন্ন বিকিরণ বিষয়ে গাণিতিক সমীকরণের সমস্যা দেখা দেয় অতি প্রবলভাবে, ইংল্যান্ড-ইউরোপের উন্নত বিজ্ঞানীমহলে। Black-body radiation law গাণিতিক সমাধান করতে না পেরে প্রায় পাগল হওয়ার মতো অবস্থায় পড়েন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা। অবশেষে ১৯০১-এ জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সেই সমস্যার সমাধান করেন ঐ বিকিরণ প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্ন কণা প্রবাহ তত্ত্ব প্রয়োগ করে। আধুনিক বিজ্ঞানে তারই নাম কোয়ান্টাম থিওরি। এই থিওরি আবিষ্কৃত না হলে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান গবেষণা অনেক ক্ষেত্রেই কানা-খোঁড়া হয়ে অচল হয়ে পড়ত। প্রতীত্যসমুৎপাদের বিচ্ছিন্ন প্রবাহ কথাটা জানা থাকলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের অত হয়রান হতে হত না। প্রতীত্যসমুৎপাদের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দিকটা মহান ভিক্ষুসঙ্ঘের কোথাও আলোচিত হয় কিনা জানা নেই।

ক্ষণিকবাদ

প্রতীত্যসমুৎপাদে অনিত্য কথায় সংসারের ক্ষণস্থায়িত্ব ও সদা গতিশীলতা বোঝায়।

এইটাই বিস্তারিতভাবে ক্ষণিকবাদ নামে পরিচিত। এখানে কার্যকারণ ধারণার মধ্যে যে জটিলতা আছে তারই বিশদ আলোচনা হয়েছে। তার সবটা এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাতে প্রধান কথা কারণ বলতে এমন পদার্থ বোঝায় যা কার্যের 'নিয়ত পূর্ববর্তীক্ষণে' বিদ্যমান থাকে। এতে নিয়ত মানে অ-ব্যতিক্রমী নিয়ম, বিশ্বের প্রত্যেকটি কার্যেই এই নিয়ত-পূর্ববর্তী কারণ থাকতে বাধ্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কারণ তৎক্ষণাৎ কার্যপ্রসূ হয় না। অথবা বাহির থেকে সেই পরিবর্তন (কার্যকারিতা) সহজে বোঝা যায় না। তার হেতু 'কারণ'-এ কার্য-উৎপাদিকা শক্তি থাকে বলে ধরা হয়। এতে শক্তির ব্যবহারে শক্তিমানের (অর্থাৎ সেই কারণের) স্বাধীন সত্তা বা অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার প্রভাব থাকবেই। তাই কারণ-এ শক্তি থাকলেও কার্যের উৎপত্তি তখনই হবে বলা যায় না। কিন্তু ঐ শক্তির জন্যই কার্যোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। যেমন আগুনে দাহের শক্তি আছে। তাই আগুন থাকলে দাহ-ও থাকবে। আগুন আছে দাহ নাই এমনটা হয় না। একইভাবে ধূম ও বহ্নির সম্পর্ক। আগুনছাড়া ধোঁয়া হয় না। দূর পর্বতে ধোঁয়ার অবিস্থিতি দেখে অবশ্যই বলা যায় ঐ পর্বতে আগুন আছে। তাই কারণে শক্তি থাকলেও কার্যের উৎপত্তি তখনই হবে বলা যায় না। কারণ ও কার্যের মধ্যে তাৎক্ষণিক ব্যবধানকে 'আনন্তর্য সম্পর্ক' বলা হয়। এই আনন্তর্য ব্যবধান দীর্ঘস্থায়ী হতেও পারে। বীজের সঙ্গে ফলের সম্পর্কটা এখানে সহজে অনুমেয়। একটি সুমিষ্ট আম্র বীজ থেকে দশ বৎসর পরে অনুরূপ সুমিষ্ট আম্রফল পাওয়া যায়। এতে প্রাথমিক আম্র বীজ ক্ষণে ক্ষণে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে অঙ্কুর, চারাগাছ ও বৃহৎ বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়। পরিণত বৃক্ষেই নূতন আম্রফল জন্মায়। এই আম্রফলটির সন্নিকট কারণ ঐ বৃহৎ বৃক্ষ, সেই দশ বৎসর পূর্বের বীজ নয়। তবু আদি আম্রবীজটাই যে মূল কারণ তাও অস্বীকার করা যাবে না। প্রতিক্ষণে ঐ আম্রবীজের মধ্যে ক্ষণিক বিনাশ, স্থিতি ও উৎপত্তির ঘটনা অসংখ্যবার ঘটার পর ঐ রোপিত বীজ ফল প্রদানে সক্ষম হয়েছে। এতে কারণ সবসময় তাৎক্ষণিক কার্যপ্রসূ হয় না এই কথা প্রমাণিত। তবে একটি কথা এখানে স্মরণীয়। বীজের নিজস্ব অবস্থা যতক্ষণ অপরিবর্তিত থাকে ততক্ষণ অঙ্কুর উদ্ভব হয় না। বিশেষ পরিবেশে বীজের পচনত্ব আরম্ভ হলেই অঙ্কুরের উৎপত্তি ঘটে। এই পচনত্বই বিনাশ পূর্বাবস্থার ক্ষয়। তাই বিনাশেই নূতন সৃষ্টি হয়, এই বিনাশ কথাটা আগের নৈয়ায়িকগণ মানতেন না।

জীবের এবং বস্তুরও এইরূপে প্রতিক্ষণে অবস্থান্তর ঘটে। সেইটাই ক্ষণিকবাদ বা ক্ষণভঙ্গবাদ। এ বিষয়ে বুদ্ধের নিজস্ব উক্তি— 'ন চ মো নচ অঞ্ঞো'— অর্থাৎ 'উহা তাহাই নহে এবং অন্যও নহে'। আগের প্রদত্ত উপমায় যে বীজ, অঙ্কু, বৃক্ষ ও ফলের কথা বলা হয়েছে তারা একও নয়, ভিন্নও নয়। একটি অপরটির দীর্ঘস্থায়ী গতিময়

রূপান্তরমাত্র (ডাইনামিক স্টেট)। ক্ষণিকবাদ-এ সেই কথাই প্রতিপাদিত। তবে এই দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিক রূপান্তর কোনোমতেই নিয়ম বহির্ভূত নয়। সব পরিবর্তনই নিয়মাধীন। বৌদ্ধশাস্ত্রে নিয়তির স্থান নেই। সেই কার্যকারণ পরিবর্তনশীল নিয়মের নামই প্রতীত্যসমুৎপাদ।

প্রতীত্যসমুৎপাদের বক্তব্যসমূহকে সাধারণের বোধগম্য করে সুন্দর উপমার সাহায্যে আলোচিত হয়েছে *নাগসেন-মিলিন্দ প্রশ্ন* নামক কথোপকথনে। এতে একটি কথা সাধারণ বুদ্ধিজীবীদের কাছে খুবই গোলমেলে হয়ে রয়েছে। সেটি হচ্ছে জন্মান্তরবাদ। ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের জন্মান্তর, আর প্রতীত্যসমুৎপাদের জন্মান্তর একই ব্যাপার নয়।

প্রখ্যাত ভিক্ষু নাগসেনের উপমায় এবং মহান বুদ্ধের নিজস্ব বক্তব্যে যে বীজ থেকে গাছের ক্রমিক উৎপত্তিতে ক্ষণিকবাদ-এর কথা রয়েছে তার প্রত্যেকটি রূপান্তর তো জন্মান্তর-এরই কথা। বীজের ধারাবাহিক পরিবর্তনটাই প্রতীত্যসমুৎপাদের জন্মান্তর। বীজের স্থলে মানুষের কথাই ধরা যাক। একজন বয়স্ক মানুষ যখন নিজের অতীত জীবনের কথা স্মরণ করেন তখন তাঁর শৈশবের দু-তিন বৎসর বয়সকালের অধিকাংশ কথাই আর মনে আসে না। আর যেখানে জীবনের সূত্রপাত সেই মাতৃজঠরের কোনও কথাই কেউ জানে না। তবু সবাই তাঁর বর্তমানের 'আমি'কে অতীতের 'আমি'র সঙ্গে এক করেই ভাবে। তাতে বালক আমি এবং বৃদ্ধ আমির মধ্যে শরীরে ও মনে যে কতরকমের ফারাক ঘটে গেছে সেই কথাটা সহজে কেউ অনুভব করে না। পরিণত বয়সে বাল্যের শরীরটা যেমন নেই, তেমনি সরল তরল মনটাও একেবারেই উধাও। কত অজস্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিশু আমি বার্ধক্যে পৌঁছায়। প্রকৃতিরাজ্যে সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহেও এমনি অসংখ্য পরিবর্তনের মাধ্যমেই সবার বৃদ্ধি ও পূর্ণতা ঘটে। যেমন সাপ খোলস ছাড়ে, গাছ বাকল ছাড়ে। গাছের বাকল ছাড়ার ব্যাপারটা কলাগাছ ইউক্যালিপ্টাস প্রভৃতি কিছু গাছে সহজেই চোখে পড়ে। এই খোলস ও বাকল হচ্ছে তাদের সহজাত আচ্ছাদন বা বাহিরের আবরণ (প্রাকৃতিক পোশাক)। সেই পোশাক নিয়মিত না ছাড়লে ঐসব জীবের বৃদ্ধি ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে না। মানুষও অনুরূপভাবে খোলস ছাড়ে। মানবদেহের সহজাত আচ্ছাদন বা বাহিরের আবরণ হচ্ছে তার চর্ম। সেই চর্মের বাহিরের কোষগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক-একটা পৃথক পৃথক ভাবে মরে যায় এবং ভিতরের জ্যান্ত কোষ থেকে পৃথক হয়ে খসে পড়ে, ঠিক ঐ সাপের খোলস ছাড়ার মতোই। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এই খোলস ছাড়ার প্রক্রিয়া একান্তই প্রয়োজন। না হলে মানবদেহেরও বৃদ্ধি হবে না। কিন্তু মানুষের খোলস ছাড়া ব্যাপারটা প্রত্যেক কোষে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটায় অর্থাৎ সব কোষে একসঙ্গে না হওয়ায় তা সহজে চোখে পড়ে না, যেমনটা সাপের খোলসে বোঝা যায়।

দেশলাইঘর

এইভাবে সবার জীবনচক্রে বহুবার বিভিন্ন ধরনের খোলস ছাড়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের ভিতরে ও বাহিরে নানারকমের রূপান্তর ঘটে। সেই পরিবর্তিত দৈহিক অবস্থার প্রত্যেকটিকে অর্থাৎ দৈহিক পরিবর্তনের প্রতিটি স্তর বা স্টেজকে রূপান্তরিত নবদেহ বা জন্মান্তর-ই বলতে হয়। এইভাবে দেহের সামগ্রিক রূপান্তর ও জন্মান্তর কথা দুটি সমার্থক-ই হয়ে পড়ে। কারণ ঐ নূতন দেহের এক নূতন জীবনের সূত্রপাত হয়। নবজীবন-ই জন্মান্তর । তাতে দেহের সামগ্রিক মৃত্যু হয় না এবং আপাতদৃষ্টিতে একই দেহে পুনঃপুনঃ নবজীবনের সূত্রপাত বা জন্মান্তর ঘটে চলে। ধর্মশাস্ত্র *গীতা*-র ২য় অধ্যায়ে ১৩নং শ্লোকে ঠিক এই কথাই আছে: 'দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা/তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি'।। অর্থাৎ জীবনচক্রে দেহীর দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা(বার্ধক্য) পরপর অন্যদেহরূপে আবির্ভূত হয় (দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ)। তাতে ধীর (জ্ঞানী) ব্যক্তি কখনও মুহ্যমান হয় না। ২য় অধ্যায়ের ২২ নং শ্লোকেও একই কথা আছেঃ- 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়/নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি/তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী'।। অর্থাৎ, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে। দেহী সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করে। প্রথম দেওয়া সংস্কৃত শ্লোকটির বাংলা তরজমা ঠিক এই ভাষাতেই হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতগণ (বা কেউ একজন) হঠাৎ একটি নূতন শব্দ মনগড়াভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন 'দেহী' কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে। 'দেহী' মানে শরীরী বা দেহধারী (ব্যক্তি)। অভিধানে এইভাবেই প্রতিশব্দ সর্বত্র দেওয়া আছে। অথচ গীতার ব্যাখ্যাকার শরীরী কথার পরে আত্মা শব্দ প্রক্ষিপ্তভাবে সংযোগ করেছেন যেন উদ্ভে দ্দশ্যপ্রণোদিতভাবে। কেননা, ঐ শ্লোকে আত্মা কথা আদৌ নেই। তাতেই যত বিভ্রান্তির সৃষ্টি। 'দেহী' বলতে কোনও ব্যক্তিকেই বোঝায়। তাতে আত্মা আসে কোত্থেকে? আর সেই আত্মা হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে অবিনাশী সত্তা। তার বিনাশ (ধ্বংস) যেমন হয় না, তেমনি কোনও পরিবর্তনও হয় না। এ এক অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কোনও জিনিসের ধ্বংস না হলেও তার পরিবর্তন তো অবশ্যম্ভাবী। ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সেই কথা অর্থাৎ ক্রমপরিবর্তন সর্বত্রই স্বীকার করে। যেমন প্রত্যেক ব্রাহ্মণ তনয়কে যজ্ঞোপবীত (পৈতা) ধারণ করে দ্বিজ হতে হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য— উচ্চবর্ণ নামে কথিত এই তিন গোষ্ঠীর প্রত্যেককেই যথানিয়মে দ্বিজ হতে হয়। দ্বিজ মানেই তো দ্বিতীয়বার জন্ম (এবং তা না মরেই) তাহলে আপাতত একই দেহে 'পুনর্জন্ম' হয়। তাতে 'অবিনাশী আত্মা' কোথায় যায়? সুতরাং *গীতা*-র ২য় অধ্যায়ের ২০ নং শ্লোকটি বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়— 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ'। অর্থাৎ, আত্মা কখনো জাত বা মৃত হন না। এ কথাকে স্রেফ ধাপ্পাবাজি বলতে হয়। মাতৃজঠরে ভ্রূণ-এর

উৎপত্তি দিয়েও জীবনের সূত্রপাত। সুতরাং সেই জঠরের বন্ধন কেটে ভূমিষ্ঠ হওয়াটা প্রথমবার জন্ম নয়। ফলে দ্বিজ কথাটাই অশুদ্ধ—মিথ্যা। ভ্রূণ থেকে পূর্ণাঙ্গ সুস্থ শিশুতে রূপান্তরিত হতে আদি জীবনসত্তায় অজস্র রূপান্তর বা পরিবর্তন ঘটে। এর প্রত্যেক অবস্থা ও অবস্থানকে জন্মান্তর বলতে হয়। সেই ভ্রূণ-এর মধ্যে যদি অবিনাশী আত্মা থাকে তবে তারও অজস্র রূপান্তর চলে। অন্যথায় বলতে হয়— ভ্রূণ-এ আত্মা থাকে না, আত্মা ছাড়াই জীবন সৃষ্টি হয়। আবার, জন্মানোর পর, দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে অবিরাম দেহী-র মনোজগতের পরিবর্তন ঘটে চলে। এই দু'ধারার ঘটনাপ্রবাহ একই জীবনে বহুবার বহুভাবে পরিবর্তিত হয়। তাই আপাতত একই দেহে বহুবার জন্মান্তর-ই ঘটে।

মহান ভিক্ষু নাগসেন এবং রাজা মিলিন্দার-এর আলোচনায় উপরে 'বালক আঙ্গ মি' এবং 'বৃদ্ধ আমি' উপমাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। তাতে উভয়েই স্বীকার করেছেন যে ঐ দুই আমি এক নয়। একইভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্যে রামায়ণে, ভয়ঙ্কর দস্যু যুবক রত্নাকর বার্ধক্যে যে ঋষি বাল্মীকি রূপে প্রতিভাত, তাতেও সুনিশ্চিতভাবে রত্নাকর ও বাল্মীকি একই সত্তা নয়। বাস্তবে রত্নাকরের জন্মান্তর ঘটেছে ঋষি বাল্মীকিতে। এতে অবশ্যই স্মরণীয় ছদ্মবেশী নারদ ও ব্রহ্মার উপস্থিতির কথা। এরা দুজন দস্যু রত্নাকরের মনে নৈতিকতার প্রশ্ন না তুললে সেই দস্যুমনের পরিবর্তন ঘটত না। এইখ ানেই পরিবেশের প্রভাব এবং শিক্ষার গুরুত্ব। তাই তো বলা হয় পাপকে ঘৃণা করো পাপীকে নয়। পাপী তো প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে নবরূপে শুদ্ধ মানবতায় রূপাঙ্গ ন্তরিত হতে পারে।

উপরের বিষয়টা বুঝতে আধুনিককালের একটি উদাহরণ বেশি সহজ হবে মনে হয়। একটি বৈদ্যুতিক বাতির কথা ধরা যাক। বিজলি বাতি যখন জ্বলে তখন সেই বাতির পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে অজস্র বিদ্যুৎকণা (ইলেক্ট্রন) প্রচণ্ড গতিতে অবিরাম ছুটে চলে। সেই গতিশীল ইলেক্ট্রনদের আমরা দেখতে পাই না এবং পরিবাহী তারটিতে বাহির থেকে কোনও পরিবর্তন বোঝা যায় না। যতক্ষণ সেই তারটি না কেটে যাচ্ছে ততক্ষণ তাকে চিরস্থায়ী মনে হয়। তার আগে পর্যন্ত ঐ একই দেহে (তারে) অবিরাম পরিবর্তন-ই চলে। একই দেহে সেই অজস্র পরিবর্তন বা রূপান্তর ব্যাপারটা একই দেহে অজস্র জন্মান্তরের পরিচায়ক। আর তারটি কেটে গেলে আলো না জ্বলাটা মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয়। তাহলে একই জীবনে আপাতদৃষ্টিতে একই দেহে অজস্র জন্মান্তর সম্ভব। এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সেই কথাই বলে। বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদে সেই কথাই পরিব্যক্ত।

আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে জ্ঞানরাজ্য নিত্য প্রসারিত হচ্ছে। আঙ্গ

গেই বলেছি বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ সুদূর অতীতে বিজ্ঞান তত্ত্বের অনন্যসাধারণ সূত্রপাত করেছে। বুদ্ধের সময়ে জ্ঞানচর্চার পরিধি ও গভীরতা যা ছিল তাতে কালক্রমে বহু বিস্ফোরক 'পরিবর্তন-সংযোজন-বিয়োজন' ঘটেছে ও ঘটে চলেছে। তার সঙ্গে উপযুক্তভাবে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে প্রতীত্যসমুৎপাদের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাতে বুদ্ধের মতবাদ সামগ্রিক সমাজে অগ্রণী স্থান পাবে না। বাস্তবে তাই তো ঘটেছে। বিজ্ঞানোন্নত দেশে বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চা ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে আর ভারতের বৌদ্ধ গোষ্ঠী অবহেলিত সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে শুদ্ধ বিজ্ঞানচেতনার অভাবে। বিষয়টি বুদ্ধানুরাগীদের গভীরভাবে ভাবা দরকার।

মহামান্য গৌতম তাঁর জীবদ্দশাতেই উক্ত বিষয়ে বিশেষ সজাগ ছিলেন। তিনি বারেবারে বলেছেন তিনি কখনো সর্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শী নন। সাতী কেবট্টপুত্ত ভিক্ষুর সঙ্গে আলোচনায় তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে তাঁকে (বুদ্ধকে) যাঁরা সর্বদর্শী ত্রিকালজ্ঞ বলে প্রচার করে তারা বুদ্ধেরই নিন্দা করে। সেই দিন পর্যন্ত যা জানা সম্ভব তাই দিয়েই তিনি যাবতীয় উপদেশ ও কর্মপন্থা তৈরি করেছেন। সেই জ্ঞানরাজ্যের বিস্তারের পরে কালোপযোগী 'নূতন বুদ্ধ' আবির্ভূত হবেন। তখন নূতন জ্ঞানের তথ্য দিয়ে নূতন ধর্মদেসনা ও তদনুযায়ী কিছু নূতন আচার অনুষ্ঠান চলবে। সেই নব বুদ্ধকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। ক্ষণিকবাদ সেই কথাও বলে। বুদ্ধের এই বক্তব্য তাঁর নিজের কথায় ঐতিহ্যগত (ট্রাডিশনাল) উদাহরণ হয়ে রয়েছে।

'সম্বোধি' লাভের পর পিতার শুদ্ধোদনের বিশেষ আবেদনে বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে পৌঁছে রাত্রে রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে এক গভীর জঙ্গলে সশিষ্য অবস্থান করেন, (শিষ্যসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ শত)। প্রাতে বৌদ্ধপ্রথা অনুসারে সশিষ্য বুদ্ধ মাটির পাত্র হাতে নগরবাসীদের দ্বারে দ্বারে যে যার আহার সংগ্রহে বেরিয়ে পড়েন। তাতে গভীর বেদনাহত হয়ে শুদ্ধোদন সাশ্রু নয়নে বলেছিলেন, সম্মানীয় রাজপুত্র হয়ে গৌতম কেন খাদ্যের জন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছেন। সমস্ত শিষ্যসহ রাজবাটীতে বুদ্ধের অন্নগ্রহণের কোনও অসুবিধা তো হত না। উত্তরে বুদ্ধ দৃঢ়ভাবেই বলেছিলেন যে, ভিক্ষা দ্বারা অন্নসংগ্রহই তাঁর বংশের ধারা। তাতে অবাক হয়েছিলেন রাজা শুদ্ধোদন পিতা হিসেবে। কপিলাবস্তুর রাজপরিবারে কেউ কখনো ভিক্ষা করেনি। বুদ্ধ তখন আবেগশূন্য কণ্ঠে বলেছিলেন— সংসারত্যাগী হয়ে তিনি এখন সন্ন্যাসী বংশের মানুষ, কপিলাবস্তুর রাজপুত্র নন। বুদ্ধের বহু আগে থেকেই ভারতবর্ষে অনাত্মবাদী সন্ন্যাসী গোষ্ঠীর সৃষ্টি। তাঁর (গৌতমের) আগে বৌদ্ধ গোষ্ঠীর ২৭ জন এই মতবাদ প্রচার করে গেছেন। গৌতম সেই সন্ন্যাসী বংশের ২৮তম বুদ্ধ। তবে আগের বুদ্ধগণ অনিত্যবাদের কথা বলেন নি।

'অনিত্যবাদ' বা ক্ষণিকবাদের স্রষ্টা হচ্ছেন এই গৌতম বুদ্ধ বা আঠাশতম বুদ্ধ। আর তাঁরই উক্তি হচ্ছে— পরে নূতন বুদ্ধ আসবেন। সর্বদেশীয় বৌদ্ধসঙ্ঘে ২৮ বুদ্ধ বন্দনার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানোন্নত যুগে কেউ নূতন বুদ্ধের কথা ভাবছেন কি?

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে হরপ্পা সভ্যতায় বেশকিছু বুদ্ধবেশী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী গবেষকরা ঐ মূর্তিগুলিকে শিবঠাকুরের প্রতীক হিসেবে প্রচার করতে চেয়েছেন। কিন্তু আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্য সেই কথা মানে না অর্থাৎ ঐগুলি শিবমূর্তি বলে প্রমাণিত হয় না। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের হোতা ঋষি উত্তঙ্কের কথা আসে। ক্ষপণক বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছদ্মবেশ ধরে তক্ষক সর্প মুনি উত্তঙ্কের আহরিত কুণ্ডল চুরি করেছিল। তারই প্রতিশোধ নিতে উত্তঙ্ক রাজা জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞে প্ররোচিত করেন। এতে মহাভারতের যুগে জনসমাজে বুদ্ধ গোষ্ঠী সুপরিচিতই ছিল— এই কথা প্রমাণিত হয়। সেইভাবেই যুগে যুগে নববুদ্ধ আবির্ভূত হওয়ার কথা।

উপরের ঐতিহাসিক কাহিনী ও নজিরগুলি মনে রেখে বৌদ্ধধর্ম ও মতবাদের চালিকা শক্তি প্রতীত্যসমুৎপাদের সম্মুখীন হতে হবে সর্ববিধ সংস্কার পরিহার করেই। বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী ধারায় সংস্কারবর্জন-ই তো কঠিন কাজ। তবে বুদ্ধের শেষ বাণী— বয়ধম্মা, সংখারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ— এই কথা ভুলে যাওয়া তো চলবে না ।

আমার সামগ্রিক বক্তব্যের উপসংহারে আসার আগে আবার বলা দরকার, আবাল্য যাঁরা বুদ্ধভাবাপন্ন তাঁদের সামনে সুমহান বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ আলোচনা— আমার পক্ষে ধৃষ্টতার সামিল। এই কথা আমি প্রথমেই কবুল করেছি। তবে প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বাদশাঙ্গের কথা একত্রে উল্লেখ না করে তার বারোটি অংশ বা অঙ্গের কথা পৃথক পৃথক তুলেছি। তাতে কিছু অংশের বিশেষ ব্যাখ্যার চেষ্টা রয়েছে। ঐসব অংশের জটিলতাগুলি বুদ্ধিজীবী মহলে নানাভাবে বিভ্রান্তি ও বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে জন্মান্তরের ধারণাটাই প্রকট। জানিনা সেই ব্যাপারে আমার এই আলোচনা কতটা সার্থক।

দ্বাদশাঙ্গ - প্রতীত্যসমুৎপাদ বিষয়টি নিম্নরূপ:

১. অবিদ্যা
২. সংস্কার
৩. বিজ্ঞান
৪. নামরূপ
৫. ছয় আয়তন
৬. স্পর্শ
৭. বেদনা
৮. তৃষ্ণা
৯. উপাদান
১০. ভব (সংসারে গমনাগমন)
১১, জাতি (জন্ম)
১২. জরা মরণ

এখানে অবিদ্যা বা অজ্ঞতাকেই প্রতীত্যসমুৎপাদের আদি কথা হিসাবে জানানো হয়েছে। সেই অবিদ্যার নিরোধ না হলে দুঃখ নিরোধ হবে না। অবিদ্যার কারণেই সংস্কারের উৎপত্তি হয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বোঝার পথে অবিদ্যাই প্রধান বাধা। অবিদ্যা দূরীকরণের জন্য যথার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞান (নলেজ অফ সায়েন্স্) প্রয়োজন। অতীতে সেই জ্ঞান ছিল নানা অনুমানের অন্ধকারে। বুদ্ধ তা জানতেন। সেইজন্যই নিজেকে সর্বদর্শী ভাবতেন না। সেই অনুমানের কুহেলি তাঁরই দেওয়া জন্মসংক্রান্ত আখ্যানে পরিব্যক্ত। সেখানে বুদ্ধ বলেছেন, 'মাতা ঋতুমতী হয়..., মাতাপিতার সঙ্গম হয়..., গন্ধর্বের উপস্থিতি হয়..., গর্ভসঞ্চার হয়'। এখানে গন্ধর্ব কথাটা ঐ কুহেলি— বিজ্ঞানের জ্ঞান নয়। সেই যুগে গর্ভসঞ্চার নিয়ে কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য ছিল না। বুদ্ধের অনুমানও এখানে সঠিক হয়নি। তবু তাঁর অনুমান ছিল অনন্যসাধারণ— যা তাঁর 'দশ অকথনীয় বা দশ অব্যক্তব্য' বিষয়ে প্রতিভাত। আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বোন্নত গতিও সেই অব্যক্তব্যে আটকে গেছে। দশ অকথনীয় সূচিতে আছে— লোক (বিশ্ব বা ইউনিভার্স) নিত্য, না অনিত্য? অর্থাৎ বিশ্ব কি একই স্থিতাবস্থায় আছে না সদা প্রসারণশীল ও সংকোচনশীল? লোক কি সসীম, না অসীম (অনন্ত)? এই জাতীয় দশটি প্রশ্ন যা আধুনিক বিজ্ঞানেও চরম জিজ্ঞাসা। তাতে বুদ্ধ বলেছেন— ঐ আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ নয়, ভিক্ষুচর্যা বা নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য ঐ অকথনীয়ের কোনও বিশেষ আবশ্যকতা নেই, তাই ঐ প্রশ্ন নিয়ে সকলে মাথা ঘামাবে না। মোহবন্ধনহীন বিরল কোনও জ্ঞানতাপস নিছক গবেষণার জন্য সেই কাজ করতে পারেন।

বিজ্ঞানময় বুদ্ধের এই দূরদর্শী সত্তাকে উপলব্ধি করতে হলে বিজ্ঞানের বিশেষ ডিগ্রি দিয়েই তা হবে না। যথার্থ প্রজ্ঞাপারমী পথে দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনাও সহজ নয়। নির্বাণলাভের পর শূন্যে বিলীন হওয়ার মুহূর্তে দুঃখতাপিত প্রাণীদের আর্ত ক্রন্দনে উদ্বেলিত পরমকারুণিক বোধিসত্ত্ব, সকল প্রাণীর দুঃখমুক্তির দিশারী হিসাবে আবার ভব সংসারে নেমে এসেছেন বলে প্রবাদ, সেই পরমকারুণিক বোধিসত্ত্বের শরণ নিয়ে, 'সবেব সত্তা সুখিতা হোন্তু'— এই প্রার্থনা জানিয়ে আমি নিরস্ত হচ্ছি।

চেতনা লহরের পক্ষ থেকে গুণধর বর্মন-এর কাছ থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকারকে ভিত্তি করে একটি জীবনীগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা চলছে।

মতুয়া এক মুক্তিসেনার নাম

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

অবিভক্ত বাংলার একটি বৃহৎ দলিত জনগোষ্ঠির নাম নমো বা নমশূদ্র। যাদের ১৯১১ সালের আগে পর্যন্ত চণ্ডাল নামে অভিহিত করা হোত। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরকালের এক আপোষহীন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সেই জাতি পরিচয়টি অপসারিত করা গেছে। যে লড়াই সঞ্চালিত হয়েছিল নমশূদ্র সমাজের এক মহান নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে। তবে চণ্ডাল অপমানজনক শব্দ নাকি নমশূদ্র অপমানজনক জাতি পরিচয় এটা নিয়ে একটা অমীমাংসিত বিতর্ক বহুকাল ধরে এই সমাজে বহমান। তাসত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, আজ এই জাতির যা কিছু সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে তার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান হরিচাঁদ-গুরচাঁদ নামের পিতা-পুত্রের। মোটামুটি এটা বলা চলে যে, হরিচাঁদের যুবা বয়স থেকে গুরুচাঁদের মৃত্যুর কাল পর্যন্ত প্রায় শতাধিক বৎসর ধরে হরি-গুরুচাঁদ কঠিন পরিশ্রমে একটি অবহেলিত অনুন্নত জাতিগোষ্ঠিকে উচ্চে তোলার প্রয়াসে কিছুটা হলেও সফল হতে পেরেছিলেন। মূলতঃ তাদের যে সমাজসংস্কার আন্দোলন তা সংগঠিত বা বিকাশ বিস্তার হয়েছিল মতুয়া নামের একটি ধর্মীয় সংগঠন ও ধর্ম আন্দোলনের মাধ্যমে।

দুশো বছর কাল সময় বিগত হয়েছে, আজকের মানুষ চিন্তা চেতনা অনেক পরিণত হয়ে উঠতে পেরেছে। বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ, বস্তুবাদের আয়নায় দেখার ফলে আজ অনেকের মনে তাঁদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে কিছু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু সমালোচনা করার পূর্বে এটা মাথায় রাখা অতি জরুরি যে তাঁরা দুশো বছর পূর্বে যে অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী নিজস্ব মতাদর্শের প্রচার-প্রসার শুরু করেছিলেন সেটা ছিল আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিহীন অশিক্ষিত অনুন্নত নিরক্ষর কুসংস্কার আর ধর্মীয় প্রভাবে জর্জর এমন একটা বিচ্ছিন্ন অঞ্চল যেখানে তথাকথিত সভ্যতার

আলো তেমনভাবে প্রবেশের কোনও সুযোগ পায়নি। আর মতুয়া ধর্মমতের সংস্থাপক হরিচাঁদ ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর, তার পুত্র গুরুচাঁদও সেই অর্থে তেমন প্রথাগত শিক্ষিত ছিলেন না। যে কারণে বহির্বিশ্বে তখনকার সময়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোনও ঘটনা কোনও মতাদর্শ সম্বন্ধে তাদের তেমন পরিচিতি ঘটার সুযোগ ছিল না।

হরিচাঁদের সমসাময়িক মহান দার্শনিক কার্ল মার্ক্স সমাজ বিষয়ক তার যে দর্শন তা হরিচাঁদের অজানা থেকে গেছে। সারা পৃথিবীর বেশ কিছু মানুষকে প্রভাবিত করতে পারলেও তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। ১৯১৭ সালে যখন সারা পৃথিবীর শ্রমিক-কৃষক খেটে খাওয়া মানুষ মার্ক্সবাদকে অবলম্বন করে একটা নতুন ইতিহাস লিখে ফেলেছে, সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে দেখ ছে তাদের --- যখন হিসেবমত গুরুচাঁদ একজন পূর্ণ বয়স্ক পরিণত মানুষ, তিনিও সে বিষয়ে থেকে গেছেন অজানা-অপ্রভাবিত।

হরিচাঁদের জীবনভিত্তিক গ্রন্থ - শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, বা গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনভিত্তিক গ্রন্থ গুরুচাঁদ চরিত, দুটোর কোনওটায় তাই সমাজ পরিবর্তন, অসহনীয় অবস্থা থেকে উত্তরণ বা ব্যবস্থার বিনাশসাধন, এমন বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তুবাদের ছাপ, ছবি তেমনভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যা তা ভাববাদ আশ্রিত, অলীক এক পরমেশ্বরের পাদবন্দনা আর নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে বর্তমানের সব দুঃখকষ্ট অপমান জ্বালা সহন করে পরপারে তরে যাবার অধ্যাত্মবাদী সনাতন পথ-পন্থার অনুসরণ।

ফলে তাঁরা মতুয়া নামের যে ধর্ম আন্দোলন পরিচালনা করেছেন--- ধর্ম আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও যার মধ্যে একটা প্রবল রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশের সবরকম রসদ মজুত ছিল তা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল প্রতাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। অশিক্ষা অজ্ঞতার কারণে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় অবচেতনে তারা সেই ব্রাহ্মণ্যবাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছেন।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় মতুয়াদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ওড়াকান্দি--- যেখান তেকেই বাংলার ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, চার জেলায় মতুয়া ধর্মমত ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই ওড়াকান্দিতেই গুরুচাঁদের জীবৎকালে হিন্দু দেবী--- যার প্রধান মহিমা এক অনার্য বীর মহিষাসুর নিধন, মহা ধুমধামে সেই দেবী দুর্গার পুজো হোত। যে পতন পচন গুরুচাঁদের জীবদ্দশায় শুরু হয়েছিল আজ তা সম্পূর্ণ হয়েছে। যেভাবে একদিন বৌদ্ধ ধর্মকে

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গিলে নিয়েছিল আজ বিদ্রোহী মতুয়া ধর্মকেও গিলে ফেলেছে। বলা হচ্ছে, হরিচাঁদ বিষ্ণুর অবতার, গুরুচাঁদ শিবের অবতার, শান্তিমাতা লক্ষ্মীর অবতার, হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ ছিল, সে অচ্ছুৎ অস্পৃশ্য নমজাতির লোক নয়। দয়া করে এই জাতিকে উদ্ধার করতে এসেছেন।

এখানে একটা প্রশ্ন আসা অতি স্বাভাবিক। যে বিষ্ণু রাম অবতারে অনার্য শম্বুক ঋষিকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছিল, যে বিষ্ণু কৃষ্ণ অবতারে অনার্য উচ্ছেদ কল্পে অর্জুনের সঙ্গে মিলে খান্ডবদাহন করেছিল, পাঁচ নিষাদকে মাতা সহ জতুগৃহে পুড়িয়ে মারা পাণ্ডবদের সখা--- সে হঠাৎ সুখের বৈকুণ্ঠধাম ছেড়ে ওড়াকান্দির মত অনুন্নত অস্বাস্থকর জায়গায় জন্ম নিয়ে নমো মানুষদের ত্রাণ করতে কেন চলে এল! বিগত সবকটা অবতার-জন্ম যার এই মানুষদের অনিষ্ট সাধন করতে কেটেছে, এই জন্মে সে হঠাৎ এত মহান আর উদার কী করে হয়ে গেল? আর হয়ে যদি গিয়েই থাকে তাহলে এই জাতির উদ্ধার না করে কেন বিদায় নিয়ে চলে গেল?

বিষ্ণু, যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র যার মুহূর্তের ইচ্ছায় সৃষ্টি আর বিলয় হয়, মাত্র কুড়ি লাখ নমো মানুষের জীবন সুন্দর আর সহনশীল করে যাওয়া তো তার কাছে কোনও কঠিন ব্যাপারই ছিল না। কেন করলেন না? আজ তাদের কোনও দেশ নেই; ওদেশে যাদের পরিচয় মালাউন, কাফের, বিধর্মী, হিন্দু আর এদেশে যাদের পরিচয় অনুপ্রবেশকারী, বাস্তুহারা, উদ্বাস্তু, রিফিউজি, শরণার্থী, বাঙাল। তিনি যখন সব জানেন এটা কী জানতেন না যে নমো মানুষদের জীবনে কী বিপর্যয় নেমে আসছে। তাহলে তাকে রোধ করতে কোনও উদ্যোগ কেন নিলেন না? তাদের উদ্ধার করতেই তো তিনি নরদেহ ধারণ করে জগতে এসেছিলেন। এই কী উদ্ধারের নমুনা?

মনে রাখা দরকার ব্রাহ্মণ্যবাদ একটা অতীব শক্তিশালী মতবাদ। তার বহু বিচিত্র রূপ, বহুরূপে সে বিদ্যমান। খুব সহজে তাকে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। জাত নয়, ব্রাহ্মণ্যবাদ একটি প্রবণতার নাম। বহু মানুষকে ঠকিয়ে নিজের ঝুলি ভরে নেবার কৌশলের নামই ব্রাহ্মণ্যবাদ। ওই যে চুল,দাড়ি, জটাজুট সাধু কুম্ভ মেলায় উদোম হয়ে ঘুরছে আর ভিক্ষা নিচ্ছে, শ্রমবিমুখ অলস ওই লোকটা আসলে ব্রাহ্মণ। জন্ম তার যে পরিবারেই হয়ে থাক, কিছু আসে যায় না।

মানুষকে ভগবান বানিয়ে দেওয়া এটাও সেই ধূর্ত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের একটা চালাকি। যত মন্দির হবে ততই তাদের ইনকাম। যে তার পূজারি নিযুক্ত হচ্ছে তার গলায় পৈতে না থাকতে পারে কিন্তু সেও আসলে লোক ঠকানো বামুনের ধান্ধাই করছে। সেও ব্রাহ্মণ্যবাদী।

বিদ্রোহী মত-পথ ভুলে বিপথগামী হয়ে যাবার ফলে হরি-গুরুচাঁদের প্রবর্তিত মতুয়া ধর্মমত আজ প্রায় দুশো বছরকাল সময় পার করে এসেও তেমন কোনও সামাজিক সুফল প্রসব করতে পারেনি। অনেক তাদের মন্দির হচ্ছে, অনেক শিষ্য হচ্ছে কিন্তু ধীরে ধীরে একটা বিদ্রোহী, ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী ধর্মমত-পথ পরিণত হয়ে গেছে বৈষ্ণব ধর্মের মতো আর একটা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপশাখায়। আজ মতুয়া ধর্মের নামে একদল গুরু গোঁসাই বোকা হাবা নির্বোধ লোকের মাথার উপরে উঠে বসে বেশ দুধে-ঘিয়ে আছে। যার বাপ মজুর খাটতো সে এক ফোঁটা ঘাম না ঝরিয়ে আজ পেয়ে যাচ্ছে এক রাজার সুখ-বিলাসিতা। এই সেদিন এক গুরুকে দেখলাম দুধ দিয়ে স্নান করছে! যে জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ রেল-লাইনের ধারে, খালপাড়ে, বস্তিতে অনাহার অপুষ্টিতে মরছে সেই জাতের এক গুরু দুধে স্নান করছে। না খাওয়া নমো মানুষের ধর্ম মতুয়া আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে। আজ হরিচাঁদের নামে হিন্দুর দেব-দেবতা অবতারের মত মন্দির নির্মাণ হচ্ছে। সেই মন্দিরের একজন পূজারি সেবাইত হচ্ছে-সেও সেই একই বামুনবাজি করে অজ্ঞ মূর্খ মানুষকে ইহকাল পরকালের ভয় দেখিয়ে শোষণ দোহন করে চলেছে।

যদিও সাগরমেলায়, কুম্ভ মেলায়, তারকেশ্বরের মেলায় যেমন ভিড় হয়, প্রতি বছর মহাবারুণিতে ঠাকুরনগরের মেলায় তেমনই ভিড় হয়। কিন্তু ভিড় তো ভিড়ই। তাই ভিড় দেখে এই ধর্ম বা মতবাদ নিয়ে আর তেমন আশাব্যঞ্জক কোনও বড় ভাবনা মনে পোষণ না করাই ভালো।

তবে বর্তমানে এইসব হওয়া সত্ত্বেও সেটা সেই সময়কালে সেই অনুন্নত যোগাযোগবিহীন শিক্ষাদীক্ষাহীন অঞ্চলে একটা বিরাট সাহসিক আর স্রোতের বিপরীত দিশায় হাঁটা কর্মকাণ্ড হিসেবে স্বীকার না করে নিয়ে কোনও উপায় নেই। হরি-গুরুচাঁদ তাদের সাধ্যমত সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যতটুকু করা সম্ভব ছিল তা করেছিলেন। দরকার ছিল তাদের সেই কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন যোগ্য উত্তরসূরির। যে ওই

মতুয়া মতবাদকে ভাববাদ মুক্ত করে বর্তমান সময়োপযোগী হিসাবে গোটা সংগঠনকে ঢেলে সাজাবার ক্ষমতা রাখেন। যে সংগঠন মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ নেবার মত সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হবে না। তেমন হলে সেটাই হোত সেই মহান দুই নেতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। তা না করে তাদের মূর্তি বানিয়ে মন্দিরে রেখে পুজো করলে আর যার যা হোক, ব্রাহ্মণ্যবাদকে বিনাশ করা সম্ভব হবে না। সে আছে, সে অবিনাশী হয়ে থাকবে।

দুই মহান ধর্মগুরু হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ এবং মতুয়া ধর্মান্দোলন নিয়ে একটি প্রাথমিক পাঠ

সুশান্ত কর

''জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা/ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা''।--- কথাটি হরিচাঁদ ঠাকুরের। শুনে যে কারোরই মনে হবে এতো বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত 'জীবে প্রেম করে যেই জন ...' কথাটির প্রতিধ্বনি। বিবেকানন্দের কথাগুলো যখন ছেপে বেরোচ্ছে এই কথাগুলোও একই সময়ে ছেপে বেরিয়েছে। আছে তারকচন্দ্র সরকারের লেখা শ্রী শ্রী 'হরিলীলামৃত' বইতে। যে গুরু হরিচাঁদের জীবনী বইটি, তিনি নিজে কথাটি বলুন বা নাই বলুন, কথাটি তাঁর নামেই চলে। বইঠি ছেপে বেরিয়েছে ১৯১৬তে। 'মতুয়া ধর্মাবলম্বী'দের বাইরে বাকি ভারতীয় তো দূরই, সাধারণ বাঙালি যে হরিচাঁদের এই কথাগুলো জানেন না বিশেষ, তাতে একটা কথা তো স্পষ্ট হয়েই যায়-- বিবেকানন্দ যতই ভারতবাসীকে ধমকে দিয়ে বলুন, ''হে ভারত ... এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা– এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে''? যতই আহ্বান জানান, ''বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ...'' আমরা এর জন্য বিবেকানন্দকে মহীয়ান করে মধ্যবিত্তের নায়ক বানিয়ে দিলাম, 'ভারতবর্ষ'কে নিয়ে গৌরব করতেও শিখলাম, যাদের তিনি ভাই বলে কাছে টেনে নিতে বললেন, তাদের আদৌ কাছে টেনে নিলাম না। হ্যাঁ, কেউ হয়তো ছায়া মাড়ালাম, ছোঁয়াটা খেলাম, বিপদে আপদে সহায়সম্বল নিয়ে পাশেও দাঁড়ালাম আর গর্ব করে 'জাত মানিনা' বলে প্রচারও করে গেলাম। কিন্তু হরিচাঁদ, গুরুচাঁদের মতো কেউ যখন সত্যি কেউ সমস্ত কাপুরুষতা দূর করে মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইলেন, বাকিদের থেকে পেলেন শুধু প্রবল উপেক্ষা। ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শে তাঁদের নায়কের সম্মান জুটল না। স্কুল কলেজের মহাপুরুষের জীবনীতেও তাঁরা রইলেন ব্রাত্য। অথচ উনিশ শতকে কলকাতা শহরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাভোগীরা যখন বিচিত্র ধর্মসংস্কার আন্দোলন

গড়ে তুলছিলেন, বাকি বাংলাদেশে সুবিধে বঞ্চিত হিন্দু দলিত এবং মুসলমান প্রজারাও ওয়াহাবী, তারিখ এ মুহম্মদীয়া, ফারায়েজি, বলাহাড়ি, কর্তাভজা, মতুয়া ইত্যাদি নানা নামে বিচিত্র সব ধর্মসংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন যেগুলো অচিরেই এক-একটি রাজনৈতিক আন্দোলনেরও চেহারা নিচ্ছিল। এগুলোর মধ্যে মতুয়া একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ধর্মসংস্কার আন্দোলন যা এখনো ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে সজীব এবং সক্রিয়। অবিভক্ত বাংলাদেশের পূববাংলা অংশে সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠীটির নাম নমশূদ্র। অনেকে বলেন, পূব বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমানদেরও অধিকাংশ আদতে এই নমশূদ্র জনগোষ্ঠীরই ছিলেন। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গোটা বাংলাতে এরা দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী ছিলেন। বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর আর খুলনা এই কটি জেলাতেই ৭৫ শতাংশ নমশূদ্র বাস করতেন। এছাড়াও অন্যান্য জেলাতে, মায় সিলেটেও নমশূদ্র বসতি নিতান্ত ফেলনা ছিল না। ১৯১১-র আদমসুমারিতেই প্রথম বহু সংগ্রামের পর এদের প্রচলিত জাতিনাম 'চণ্ডাল' মুছে যায়। এর আগে অবধি এরা এই নামেই পরিচিত ছিলেন। এবং বাকি বাঙালি হিন্দুরা এদের অস্পৃশ্য বলে মনে করতেন বা এখনো মনে করে থাকেন। স্মার্তকার রঘুনন্দনের নির্দেশে এদের সঙ্গে বিবাহাদি তো দূর, পংক্তিভোজনও এড়িয়ে চলত উঁচুবর্ণের বাঙালি।

১৯১১-র আদমসুমারি অবধি দেখা গেছে নমশূদ্রদের ৭৮ শতাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি। এবং এই কৃষিজীবিদের মাত্র ১.১৫ শতাংশ মানুষ নিজেরা খাজনা পেতেন। তার মানে মোটের উপরে এরা শ্রেণি এবং বর্ণ দুদিক থেকেই ছিলেন দলিত। যে জমিদারদের অধীনে প্রজা হয়ে থাকতেন তাদের অধিকাংশই বর্ণহিন্দু। সামান্য কিছু সৈয়দ মুসলমান। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-- ''বাংলার কৃষিসমাজে বড় যে বিভেদ তা হলো 'খাজনাভোগী' এবং 'খাজনা প্রদানকারী' দের মধ্যে, এই এই ক্ষেত্রে তা নিখুঁতভাবে মিলে গিয়েছিল জাতিভেদের সঙ্গে। এই বিভেদ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলত নানা ধরনের অত্যাচারের ফলে। তার মধ্যে ছিল মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ, বেআইনি কর আদায়, খাজনার বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি সহজ নগদ খাজনার বদলে উঁচুহারে খাজনা আদায় করা''।[২] এর মধ্যেও একটি ছোট গোষ্ঠী নিশ্চয়ই নানা ছোটখাটো ব্যবসা এবং মহাজনী কারবার ইত্যাদি করে সামাজিক মর্যাদার উপরের স্তরে উঠেছিলেন। ''তবে ১৯১১ সালে এই বর্ধিষ্ণু গোষ্ঠী গোটা নমশূদ্র

জাতির জনসংখ্যার ২ শতাংশেরও কম ছিলেন''।[৩] এই শ্রেণিটি সংখ্যার দিক থেকেও কম ছিলেন, বাকি মহাজন শ্রেণি বন্ধুদের থেকেও অতি দুর্বল ছিলেন। সবচে' বড় কথা, ''...সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে ছিলেন এতো নিচের দিকে যে তাঁরাও উঁচুজাতের ভদ্রলোকের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম ভাবতে পারতেন না''।[৪] তখনকার নানা ধরনের কৃষক বিদ্রোহ এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে এঁদের পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু বিশ শতকের গোড়াতে যাঁদের নেতৃত্বে বাংলাভাগের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে উঠেছিল এবং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ রূপ পাচ্ছিল, শ্রেণি এবং বর্ণ দু'দিককার স্বার্থেই এঁরা তার সঙ্গে কোনও ধরনের আত্মীয়তা খুঁজে পান নি। ফলে কলকাতা কেন্দ্রিক যেসব ধর্মসংস্কার আন্দোলন সেগুলোর প্রতিও কোনওদিনই এঁরা আকর্ষণ বোধ করেননি। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এঁদের নেতা হয়ে উঠতে পারেন নি কিছুতেই, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেনদের তো প্রশ্নই ওঠে না।

চাইলেই যে অন্ত্যজ জাতবর্ণের শ্রেণিগতভাবে উপরের লোকেরা বর্ণগতভাবে উপরের লোকজনের কাছাকাছি আসতে পারেন না, এর নজির দিতে গিয়ে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ১৮৭২-৭৩, এই সময় এক বিশিষ্ট নমশূদ্র গ্রামীণ নেতার মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উঁচুজাতের লোকেরা আসতে অস্বীকার করেন। তার প্রতিবাদে ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ এলাকার সমস্ত নমশূদ্ররা এই উঁচুজাতের সঙ্গে সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক সম্পর্কে ছেদ করেন। এই লড়াই প্রায় ছ'মাস চলে। এই লড়াই-এর সফলতা কিম্বা বিফলতাই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে নতুন ধর্মসম্প্রদায়ে নিজেদের সংগঠিত করতে– যার নাম 'মতুয়া'। এই ধর্মীয় লড়াই এক সময় এর প্রবর্তকের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর-এর নেতৃত্বে আরো এগিয়ে যায় এবং ক্রমেই এক স্পষ্ট রাজনৈতিক রূপ পেতে থাকে। সেই রূপ পূর্ণতা পায় ১৯১২ তে Bengal Namasudra Association গঠনের মধ্যে দিয়ে। যা ক্রমে গিয়ে নানা বাঁকে এবং ফাঁকে আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় দলিত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়েছিল এবং এখনো জড়িয়ে আছে। সেই ইতিবৃত্ত অন্য। আপাতত শুধু একটি তথ্যের উল্লেখ করব যে ১৯১১-র আদমসুমারির পরে ১৯৩৬ অবধি এই 'শূদ্র' শব্দটি বাদ দেবার জন্যেও অনেকে লড়েছিলেন। সফল হয়েছিলেন বলে কোনও তথ্য আমাদের হাতে নেই।

১৮১২ সালের ১১ মার্চ এখনকার বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দির পাশে সাফলিডাঙ্গা গ্রামে জন্ম নেন হরিচাঁদ ঠাকুর। তাঁর বাবার

নাম ছিল যশোবন্ত ঠাকুর, মা অন্নপূর্ণা। পাঁচ সন্তানের তিনি দ্বিতীয়। তিনি 'হরিনামে মুক্তি' কথাটা বাকি বৈষ্ণবদের মতো প্রচার করলেন বটে কিন্তু সেই মুক্তিতত্ত্ব বাকি সহজিয়া বৈষ্ণবদের থেকেও সহজ। 'গৌড়িয় বৈষ্ণব' দের থেকে একেবারেই ভিন্ন। তাই এর নামও ভিন্ন। হরিনামে মাতোয়ারা– এমন এক ধারণার থেকে ধর্মসম্প্রদায়টির নাম হলো 'মতুয়া'। বর্ণগতভাবে এঁরা মূলত বাঙালি দলিত নমশূদ্র সম্প্রদায়ের লোক, যদিও মতুয়া ধর্মে অন্যান্য বর্ণের লোকেরাও অনেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। মতুয়া ধর্মের মূল কথাগুলো বোঝা খুব কঠিন নয়। বৌদ্ধধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গের আদলে হরিচাঁদেরও ছিল দ্বাদশ আজ্ঞা-- ১. সদা সত্য কথা বলা। ২. পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করা। ৩. পিতামাতাকে ভক্তি করা। ৪. জগতকে প্রেম দান করা। ৫. পবিত্র চরিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতিভেদ না করা। ৬. কারো ধর্ম নিন্দা না করা। ৭. বাহ্য অঙ্গে সাধু সাজ ত্যাগ করা। ৮. শ্রীহরি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। ৯. ষড় রিপুর থেকে সাবধান থাকা। ১০. হাতে কাজ মুখে নাম করা। ১১. দৈনিক প্রার্থনা করা। ১২. ঈশ্বরে আত্মদান করা। সম্প্রতি এই ধর্ম নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে, তর্কবিতর্কও হচ্ছে মতুয়া সমাজের বাইরেও ভেতরে তো বটেই। কিন্তু হরিচাঁদের জীবৎকালে লিখিতভাবে কোন ধর্মাদেশ দাঁড় করাবার চেষ্টা ছিল না। তারক সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' বইটি লেখা হলেও প্রকাশের অনুমতি দেননি হরিচাঁদ। বস্তুত পছন্দও করেননি। সুতরাং তাঁর ধর্মমত ছড়িয়েছিল লোকের মুখে মুখে, স্মৃতিতে, গানে, কীর্তন আসরে। বৈদিক অবতারত্ব, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, আচার-বিচার কিছুতেই আস্থা রাখ তেন না তাঁরা। এমনকি যে হরিনামের কথা বলা হচ্ছে তিনিও বৈষ্ণব হরির থেকে ভিন্ন। অনেকের মতে মতুয়া ধর্ম আসলে বাংলাদেশের প্রাক্-বৈদিক বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থিত, পুনর্নির্মিত রূপ। একত্রে অনেকে মিলে নাম করলে প্রেমবোধ জাগে তাই এই নাম নেয়া।[৫] শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতেও আছে, ''বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণ জন্য/যশোবন্ত গৃহে হরি হৈল অবতীর্ণ।

১৮৩৩ নাগাদ প্রায় একুশ বছর বয়সে হরিচাঁদ স্থানীয় জমিদার এবং ব্রাহ্মণ্যশাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে জন্মগ্রাম ছেড়ে ওড়াকান্দি চলে আসেন। জমিদারদের দরিদ্র কৃষক লুণ্ঠনের ব্যাপারটিতো তিনি জানতেনই। কিন্তু এখানে এসেই উপলব্ধি করেন কলকাতার জমিদারদের বিলাসবৈভবের রহস্য। মাত্র তিনমাসের খোরাকি দিয়ে এরা গোটা বছর কৃষকের ঘাম ঝরিয়ে নিত। বেগার খাটাতো। এমনকি দাসের বাজারে কেনাবেচাও করে দিত গরীব

চাষাদের। ১৮৪৬ নাগাদ এই দাসব্যবসা বন্ধ করে ফেলা ছিল মতুয়াদের প্রথম বড় সাফল্য। 'শাস্তিবিক্রি' নামে একটি অদ্ভুত প্রথা চালু ছিল বাংলাদেশে। বাবু জমিদারেরা খুন-রাহাজানির মামলাতে জড়ালে দলিত অন্ত্যজ লোকেদের লোভ কিম্বা ভয় দেখিয়ে নিজের কাঁধে দায় নিয়ে বাবুদের বাঁচিয়ে দিতে বাধ্য করা হতো। হরিচাঁদের নেতৃত্বে এই কুপ্রথা এবং সেই সঙ্গে নরবলির বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন শুরু হয়। লেখাই বাহুল্য যে নরবলির শিকার হতেন এই নমশূদ্রদের মতো দলিতরাই। ফলে আশেপাশের বিভিন্ন জেলাতে মতুয়াদের কথা ছড়িয়ে পড়ে।[৬]

ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করবার ব্যাপারটি একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন এবং তার এর জন্যই য়ে সামন্তসমাজে দুটিকে আলাদা করে দেখাই কঠিন। য়ে মধ্যবিত্তরা শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পটি পড়েছেন তারা দেখেছেন কীভাবে জমিদারের জমির লোভের প্রকাশ ব্রাহ্মণের শাস্ত্রের দোহাই হয়ে প্রকাশ পায়। তাই একুশ শতকের কিছু শহুরে মধ্যবিত্ত যখন নির্বিচারের এইসব দলিতদের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ধর্মের বিচ্ছেদ আশা করেন, তখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসলেই তারা সামন্তপ্রভুদের স্বার্থকে সুরক্ষা দেন। তখনকার তো বটেই এখনো, বহু দলিত আদিবাসী আন্দোলন থেকে তাই রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং ধর্মের বিকাশকে স্বতন্ত্র করে দেখা এক কঠিন কাজ। লালন ফকিরকেও জমিদার শাসনের বিরুদ্ধে লাঠি নিতে হয়েছিল, তাও আবার যে সে নয়-- একেবারে বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের বিরুদ্ধে। লালন ফকিরের গানগুলোতে সহজিয়া দেহতত্ত্ব আবিষ্কার করে আজকের বহু মধ্যবিত্ত। মুগ্ধতার মধ্যে কিছু সত্য নিশ্চয় আছে, 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে'র মত গানের মধ্যে জাতবর্ণ বিরোধিতার তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সন্ধানের মধ্যেও মিথ্যা কিছু নেই। কিন্তু এর মধ্যে আটকে থাকাটি হচ্ছে এক চূড়ান্ত মধ্যবিত্ত ভণ্ডামি। কেউ ব্যক্তিগতভাবে জাত না মানবার দাবি করলেই জাত সংসার থেকে বিদায় নেয় না। কথা হলো তার বিরুদ্ধে কোনও সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছে কিনা। চাইলেই সেই প্রতিরোধের বাস্তবতা সর্বত্র নাও থাকতে পারে, তখন গ্রামীণ কৃষক সমাজে দেখা দেন লালনের মত ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রতিবাদী, কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদী। উল্টোদিক থেকে এমন প্রতিরোধ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা মাত্রকে নিরাকরণ করবার প্রয়াস চিরদিনই ছিল উচ্চবর্ণের দিক থেকে। দলিতদের উত্থান বিবেকানন্দকেও বিচলিত করেছিল, কিন্তু তাঁর সমস্যা ছিল অন্যদিক থেকে। এগুলোকে তিনি সর্বভারতীয়

জাতীয়তা নির্মাণের বাধা হিসেবে দেখেছিলেন। তাই একদিকে যেমন উঁচু বর্ণের লোকেদের ডেকে বলেছেন--- বলো চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই! অন্যদিক থেকে এই প্রশ্নও করেছেন ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা দেখে এতো ঈর্ষান্বিত হবার কী আছে? সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়ে তাদের টেক্কা দিলেই হলো।[৭] তিনি আশা করেছেন, মৎস্যজীবীর কাছে গিয়ে কেউ বেদান্ত ব্যাখ্যা করলেই সবার ভেতরে একই ঈশ্বর দেখে মৎস্যজীবী মুগ্ধ হয়ে যাবে।[৮] কিন্তু এই কথাটি যে মৎস্যজীবীর থেকে বেদান্তবাদী পণ্ডিত এবং তাঁদের অনুগামী শাসকশ্রেণির লোকেদের বেশি করে বোঝা দরকার, এবং না বুঝতে তার বিরুদ্ধে রীতিমত সংগঠিত প্রতিবাদটি দরকার এই সত্য বিবেকানন্দ বুঝতে চেয়েছেন বলে মনে হয় না। বরং এমন প্রতিবাদে কোনও লাভ হবার নয় বলেই তিনি মত ব্যক্ত করেছেন, বৃটিশভারত বর্ণ ব্যবস্থাটিকে অপ্রাসঙ্গিক করে ফেলেছে বলে প্রশংসাও করেছেন। যখন কিনা, বিনয় ঘোষের মতো মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা ১৯৭৮-এ এসেও বৃটিশ ভারতে জাত-বর্ণ ব্যবস্থা বিলীন হয়ে যাবে বলে স্বয়ং কার্ল মার্কসের অনুমানকেও নাকচ করে এক নতুন অধ্যায় জুড়ছেন তার তিন দশক আগের লেখা 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থে। হরিচাঁদ এবং তাঁর পরে গুরুচাঁদ সেই সংগঠিত প্রতিবাদের পথ ধরেছিলেন বলেই বাকি বাঙালি সমাজ তাদের সম্পর্কে লালন করেছে এক আশ্চর্য নীরবতার নীতি। সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন বলেই হরিচাঁদ কাউকে সন্ন্যাস নিতে বা তীর্থে যেতে মানা করেন। 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত'-এ লেখা হচ্ছে, ''সংসারে থেকে যার হয় ভাবোদয়/সেই পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়''। সংসার এবং মানুষের বাইরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলা হচ্ছে, ''যে যাহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর/ভক্তিযোগে সেই তার স্বয়ং অবতার'' কিংবা, ''বিশ্বভরে এই নীতি দেখি পরস্পর/যে যাহারে উদ্ধার করে সে তাহার ঈশ্বর''। সুতরাং কোনও দীক্ষা নেই, নেই গুরু গোঁসাই, ''দীক্ষা না করিবে না তীর্থ পর্যটন/মুক্তি স্পৃহাশূন্য নাই সাধন ভজন''। গুরু গোঁসাই সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে হরিচাঁদের উক্তি, ''কোথায় ব্রাহ্মণ দেখো কোথায় বৈষ্ণব/ স্বার্থবশে অর্থলোভী যত ভণ্ড সব''। গুরু গোঁসাইদের শাস্ত্রানুশাসনকে অমান্য করে তাঁর চরম অবস্থান, ''কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই/বেদবিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই''। এগুলো শুধু ব্রাহ্মণরাই সহ্য করবেন না এমন তো নয়, গোটা সামন্তসমাজের শাসন মানিয়ে নেবার প্রাথমিক শর্ত এগুলো। স্বাভাবিকভাবেই নিন্দা, অপপ্রচার, লাঠিয়াল দিয়ে পেটানো, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, পুকুরে বিষ দেয়া, গায়ের জোরে মাঠের

ধান কেটে নিয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি সামাজিক বয়কট হলো মতুয়াদের। এর সঙ্গে ছিল নীলকর সাহেব ওবং নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচার। একবার তো এমন কিছু নায়েব এবং সাহেবদের নীলের কড়াইতে ফেলে সেদ্ধ করে ফেলেন এই লাঠিয়ালরা।[৯] সংকটে দীর্ণ মতুয়াদের বিয়ে শ্রাদ্ধে ব্যয় কমাতে নির্দেশ দিলেন হরিচাঁদ, ''বিবাহ শ্রাদ্ধতে সবে কর ব্যয় হ্রাস/শক্তির চালনা, সবে রাখো বারোমাস''। উৎপাদন ব্যবস্থার উপর চাষীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়েও ভেবেছিলেন তিনি, ''মন দিয়ে কৃষি কর, পূজ মাটি মায়/মনে রেখো বেঁচে আছো মাটির কৃপায়''। চাষাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াতে বছরে তিনবার ফসল ফলাতে উদ্বুদ্ধ করলেন, ''সর্বকার্য হতে শ্রেষ্ঠ কৃষিকার্য হয়/ ত্রিফলা না করা আমাদের ভাল নয়''। উদ্বৃত্ত অর্থকে ব্যবসায়ে খাটিয়ে ধনলাভে উৎসাহিত করতে নিজে শিখে অন্যকে শেখাতে শুরু করলেন, দরকারে অনেককে টাকা ধার দিতেও শুরু করলেন, ''নিজহাতে ব্যবসা করেন হরিচাঁদ/বাণিজ্য প্রণালী শিক্ষা সবে কৈল দান''।

পুত্র গুরুচাঁদকে উত্তরদায়িত্ব সমঝে দিয়ে ১৮৭৮-এ হরিচাঁদ মারা যান। গুরুচাঁদের জন্ম ওড়াকান্দিতে ১৮৪৪-এ। তিনি মারা যান ১৯৩৭-এ। বাবা-ছেলের জীবৎকাল ১২৫ বছর থেকে হরিচাঁদের ছেলেবেলার প্রথম একুশ বছর বাদ দিলেও বলা চলে উনিশ-বিশ শতকের একশত বছর জুড়ে মতুয়া ধর্মান্দোলন ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান ধর্মসংস্কার আন্দোলন। যদি ব্রাহ্মধর্ম সংস্কার আন্দোলনের কথা মনে রাখি, তবে এত দীর্ঘ নির্বিরোধ জীবন সেই ধর্মের ছিল না। এত বিশাল সামাজিক সমর্থনও ছিল না ব্রাহ্মধর্মের। তারপরেও ব্রাহ্মদের চিনি, মতুয়াদের নয়।

দায়িত্ব নিয়েই গুরুচাঁদ শিক্ষাবিস্তারে মন দিলেন। নিজের বাড়িতে পাঠশালা খুলে শুরু করলেন। তাঁর সম্পর্কে জানবার নির্ভরযোগ্য প্রথম বইটি লেখেন মহানন্দ হালদার, নাম 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৩-এ। গুরুচাঁদ সবাইকে নির্দেশ দিলেন, ''সবাকারে বলি আমি যদি মানো মোলে/অজ্ঞ বিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে''। এই শিক্ষান্দোলনের পাশে তিনি বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে কাছে টেনে নেন। ''নম সাহা তেলি মালি আর কুম্ভকার। কাপালি মাহিষ্য দাস চামার কামার /পোদ আসে তাঁতি আসে আসে মালাকার/ কতই মুসলমান আসে ঠিক নাহি তার'' । মেয়েদের জন্যেও সমানে আলাদা উদ্যোগ নেন, ''নারী শিক্ষার তরে প্রভু আপন আলয় শান্তি সত্যভামা নামে

স্কুল গড়ি দেয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন শ্রীনিকেতনের প্রথম দিককার দিনগুলোতে বৃটিশ কৃষিবিজ্ঞানী এবং সমাজসেবী লিওনার্ড এলমহার্স্টকে নিয়ে এসেছিলেন, গুরুচাঁদ তেমনি এক অস্ট্রেলিয় মিশনারি ডা সি. এস. মিডকে সঙ্গে পেয়ে যান। দরিদ্র অন্ত্যজদের মধ্যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ছড়াবার ব্যাপারে এই ভদ্রলোক ছিলেন আন্তরিক। তাঁর বিরুদ্ধে খৃষ্ট ধর্মে স্থানান্তরিত করবার অপপ্রচার ছিল, কিন্তু স্বপক্ষে সাক্ষী বেশি নেই । বরং ১৯০৬ থেকে গুরুচাঁদের সঙ্গে আলাপ এবং বন্ধুত্বের পরে থেকে সেই সম্পর্ক ছিল অটুট। শুধু তাই নয়, ১৯০৮-এ ওড়াকান্দিতে এই দুজনের প্রচেষ্টাতে যে উচ্চ ইংরাজি স্কুল যাত্রা শুরু করে শতাব্দ প্রাচীন সেই স্কুলের নাম 'ওঢ়াকান্দি মিড হাইস্কুল' রেখে মতুয়ারা তাঁকে স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিড অভিজ্ঞ মানুষ, তার উপর সরকারি মহলে তাঁর খাতির ছিল । গুরুচাঁদ বুঝেছিলেন তিনি যে কাজ করতে যাচ্ছেন তাতে দুটোরই সমান দরকার। তাঁর সেই বোধে ত্রুটি ছিল না, ঘটনাক্রম তা প্রমাণ করেছে। নারী-পুরুষের জন্য আলাদা স্বাস্থ্যকেন্দ্রও গড়ে উঠতে শুরু করল ওড়াকান্দি এবং আশপাশের এলাকাতে। একইসঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে চলে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ বিরোধী প্রচার আন্দোলন। তখন থেকেই নমশূদ্র শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের জন্য সরকারি চাকরিতে ভাগীদারির দাবি উঠতে থাকলে অনেকেই মনুর বিধান শুনিয়ে আটকে দিচ্ছিলেন। ১৯০৭-এ সরকার প্রথম আইন করে অন্ত্যজ এবং মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে গুরুচাঁদ ঠাকুরের ছেলে শশীভূষণ ঠাকুর সাবরেজিস্ট্রার পদে যোগ দিতে পারেন। এর আগে নানাভাবে চেষ্টা করেও তিনি কোনও চাকরি পেতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। ১৯০৮-এ্ কুমুদ বিহারি মল্লিক ডেপুটি রেজিস্ট্রার পরে এবং তারিনী বল সরকারি ডাক্তার হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন।

'চণ্ডাল'রা সরকারি চাকরিতে আসছেন, পঞ্চায়েত পুরসভাতে যোগ দেবার সম্ভাবনা বাড়ছে এই ব্যাপারটি উঁচুবর্ণের লোকেরা ভালভাবে নিচ্ছিলেন না। স্বাভাবিক ভাবেই মনুর বিধান ডিঙিয়ে সাহেবদের প্রশ্রয়ে অন্ত্যজ বর্ণের মানুষের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় মর্যাদাতে উন্নীত হবার আকাঙ্খা-দাবিও বাড়তে থাকে। জয়া চ্যাটার্জি লিখেছেন--- ১৯১১তে আদমসুমারি কর্তৃপক্ষের কাছে এমন দাবি জানিয়ে এতো সব জনগোষ্ঠী স্মারকপত্র জমা দেন যে সব মিলিয়ে এগুলো ওজনে দাঁড়িয়েছিল এক মণের বেশি। নমশূদ্ররা তখন নিজেদের কায়স্থ বলে দাবি করলে কায়স্থরা সেটির বিরোধিতা করেন। তাতে কায়স্থদের সামাজিকভাবে বয়কট করলেন নমশূদ্ররা। গোয়ালারা নিজেদের বৈশ্য বলে

দাবি করলে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা অনেকে গোয়ালাদের ছেড়ে মুসলমানদের থেকে দুধ কিনে খেতে শুরু করেন।[১০] ডা: মিডকে পাশে নিয়ে তখন অন্তত 'চণ্ডাল'দের জন্য 'নমশূদ্র' কথাটি আদায় করে নিতে সমর্থ হন গুরুচাঁদ।

যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল একেবারেই ধর্মসংস্কার এবং কৃষকবিদ্রোহ রূপে সেটি তখন রীতিমত আইনি রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে এগোতে শুরু করে। গুরুচাঁদ অনুভব করেন, ''যে জাতির দল নেই/সেই জাতির বল নেই।/ যে জাতির রাজা নেই/সে জাতি তাজা নেই''। তাঁর আহ্বান, ''বিদ্যা যদি পাও কাহারে ডরাও/কার দ্বারে চাও ভিক্ষা।/রাজশক্তি পাবে বেদনা ঘুচিবে/কালে হবে সে পরীক্ষা''। সে রাজনীতি গুরুচাঁদের মৃত্যু অবধি পরিচালিত হয়েছিল একেবারেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে। বরং ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে শুরু থেকেই তাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। এরই ধারাবাহিকতাতে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন তেভাগা আন্দোলনেরও বড় সমর্থন ভিত্তিটিই ছিলেন এই নমশূদ্ররা। বাকি বড় অংশটি রাজবংশী কৃষক।

১৯৩৭ গুরুচাঁদের মৃত্যুর আগে-পরে মতুয়া ধর্মান্দোলনে যেমন নানা মতভেদ দেখা দিতে শুরু করে তেমনি রাজনৈতিক মত এবং পথও নানা শাখাতে বিভাজিত হয়ে যায়। যে বিভাজন এখনো সমানে সক্রিয়। কিন্তু তারপরেও এটা ঠিক যে গুরুচাঁদের এই উদ্যোগের ফলেই ১৯৩৭-এর নির্বাচনে বাংলা থেকে ৩২জন প্রতিনিথি নানা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর থেকে নির্বাচিত হলে তার মধ্যে ১২ জনই ছিলেন নমশূদ্র সম্প্রদায়ের। তাদের মধ্যে কয়েকটি নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ-- যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বিরাট চন্দ্র মণ্ডল, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর প্রমুখ। আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় দলিত আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িয়েছিল অনেকে। তাদেরই সমর্থনে আম্বেদকর গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১১] স্বাধীনতার আগের শেষ দশকে যে বিচিত্র রাজনৈতিক ডামাডোলে বাংলাদেশ প্রবেশ করে তাতে নমশূদ্র সমাজের আগেকার ঐক্য রাখাটাও কঠিন ছিল। তার উপরে শিক্ষিত শ্রেণিটির সংখ্যা বাড়তে থাকায় তাঁদের অনেকে সাংবিধানিক রাজনীতিতে বেশি করে জড়াতে গিয়ে বাকি কৃষক জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সেই নেতৃত্বের কেউ মুসলিম লীগ, কেউ জাতীয় কংগ্রেস এবং অনেকে হিন্দু মহাসভারও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। বিশেষ করে গুরুচাঁদের পৌত্র প্রমথ ঠাকুরের ভূমিকা তখন থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ হতে শুরু করে। সেটি হতে পারে অধ্যয়নের এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। কিন্তু যে দুর্বিপাকের কথাটি না বললেই

নয় তা এই যে, হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যাওয়া বড় অংশটি আশা করেছিলেন বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা ইত্যাদি পূব বাংলার নমশূদ্র অধ্যুষিত জেলাগুলো পশ্চিমবাংলাতে চলে যাবে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রথমে শরৎ বসু, ফজলুল হকের প্রস্তাবিত 'অখণ্ড বাংলা'র প্রস্তাবের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে মুসলীম লীগ এবং পাকিস্তানের প্রস্তাবের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। দুপক্ষই প্রবঞ্চিত করেছিলেন। পাকিস্তানে প্রবঞ্চিত হয়ে পঞ্চাশের গণহত্যার পরে লিয়াকৎ আলি খানের মন্ত্রীসভার থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ এবং ভারতে চলে আসা মাঝেমধ্যে বেশ চর্চিত হয়। বস্তুত দু'দেশের শাসক শ্রেণিই বাধ্য করে নমশূদ্রদের বড় অংশকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসতে। এবং বাকি বর্ণহিন্দুরা যখন ভারতে নিজের ব্যবস্থা যা হোক একটা করে নিতে সমর্থ হয়েছেন, নমশূদ্রদের কিন্তু বাসাবাটির সন্ধানে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে সাগরে আন্দামান থেকে পাহাড়ে উত্তরাখণ্ড অবধি গোটা ভারতে। অসমেও এসেছেন বিশাল সংখ্যক নমশূদ্র মানুষ। সিলেট ভাগের সময় থেকেই এই নমশূদ্রদের অবস্থান ছিল দ্বিধাজড়িত। অনেকেই সিলেট ভাগের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এক দশক আগেও ১৯৩৭-৩৮ -এ সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমাতে শিমুলঘর গ্রামে বর্ণহিন্দুদের উপস্থিতিতে শুধুমাত্র জুতো পরবার অধিকার আদায়ের জন্য এক বড়সড় লড়াইতে নামতে হয়েছিল নমশূদ্রদের। যা পরে হিংসাত্মক রূপ নিয়েছিল।[১২] সিলেট গণভোটের সময় তৎক্ষণিক ভাবে পংক্তিভোজনে বসে সেই দলিতদের মন জয় করতে নেমেছিলেন বর্ণহিন্দু নেতৃত্ব। সিলেট ভাগের দায় যারা একতরফা অসমিয়া উগ্রজাতীয়তাবাদের উপরে চাপান তাঁরা নিজেদের এই দায়কে নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করেন না। এখনো জল-জমির অধিকারের সঙ্গে নাগরিক অধিকার, সংরক্ষণ এবং ভাষা সংস্কৃতির জন্য নমশূদ্রদের লড়ে যেতে হচ্ছে শুধু অসমেই নয়, গোটা ভারতেই। অসমে ডি-ভোটার তাদেরকেই বেশি হতে হয়। মরিচঝাঁপির কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়েছে নমশূদ্রদেরই। দেশভাগ এবং বাংলার সবচে' বড় দলিত জনগোষ্ঠী এই নমশূদ্রদের দেশময় ছড়িয়ে পড়ার একটি অন্যতম কারণ যে দেশভাগের আগে বাঙালি সমাজে গড়ে ওঠা দলিত আন্দোলন পরবর্তী দশকগুলোতে বেশ চাপা পড়ে গেছিল।

মতুয়া ধর্মান্দোলনে এখন অনেক বিভাজন। অনেকেই হতাশ হয়ে সরাসরি আম্বেদকরের শুরু করা নববৌদ্ধ ধর্মান্দালনের দিকে ঝুঁকছেন। মতুয়াদের বড় দুই ভাগের একটি 'শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মতুয়া মিশনে'র অধীনে পরিচালিত হয়।

এর প্রধান কেন্দ্রটি এখনো বাংলাদেশের ওড়াকান্দিতেই রয়েছে। গুরুচাঁদের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৌত্র শ্রীপতি প্রসন্ন ঠাকুর পরম্পরা হয়ে মিশনের নেতৃত্ব এখন রয়েছে পদ্মনাভ ঠাকুরের হাতে।[১৩] শ্রীপতি প্রসন্ন-এর সঙ্গে বিবাদ বাঁধে অপর পৌত্র প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের। তিনি গুরুচাঁদের মৃত্যুর পর প্রথমে রামদিয়াতে চলে এসে ১৯৪০-এ মতুয়া মহাসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রধান কেন্দ্র এখন র য়েছে পশ্চিমবাংলার উত্তর চব্বিশ পরগণার ঠাকুরনগরে। নেতৃত্বে রয়েছেন প্রমথ রঞ্জনের স্ত্রী বীনাপাণি দেবী, যাকে মতুয়ারা 'বড়মা' বলে সম্মান করে থাকেন। দুটো সংগঠনেরই এখন দেশেবিদেশে প্রচুর শাখা রয়েছে।

ওড়াকান্দির মিশন গুরুচাঁদের জীবিতাবস্থাতেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু সেটি কতটা তাঁর ইচ্ছেতে এবং কতটা তাঁর পুত্র-পৌত্রেরা চাপ দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন সেই নিয়ে সন্দেহ আছে। মিশনের সাইটেই অসীম কুমার রায়ের একটি দলিলে লেখা আছে, ''শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রস্তাবটি শুনে বলেন এটি করার সময় এখনও হয়নি ''।[১৪] ভারতের মতুয়া সঙ্ঘের কাজকর্ম বড়মার অনুগামীদের রাজনৈতিক সারশূন্য 'উৎসবপ্রীতি' নিয়ে মতুয়ারাই নানাভাবে প্রশ্ন তুলে থাকেন। বাংলাদেশের মিশনের কাজকর্ম দেখলেও মনে হয় না তাঁরা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের আদর্শে আর ততটা টিকে আছেন। মতুয়াদের ব্রাহ্মণ্য 'সনাতন' ধর্মের একটি অংশে পরিণত করবার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ করেছেন। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদকে 'শিব' বলে প্রচার করছেন-- এইসবের পরে আর আঙ্গু মরা উপরে মতুয়া হরিচাঁদের যে দ্বাদশ আজ্ঞার কথা জেনে এলাম সেগুলোর কোনও মানে থাকে না। মিশন নিয়ে গুরুচাঁদের উপরে পারিবারিক চাপ সৃষ্টির কথা আমরা অহেতুক বলিনি। দেখা যাচ্ছে, সমস্ত ব্রাহ্মণ্য পরম্পরার বিরোধী ব্যক্তিত্ব গুরুচাঁদের বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রচলন করছেন তাঁর পুত্র-পৌত্রেরা এবং সঙ্গে জুটছেন সমাজের প্রভাবশালী ভক্তেরা। অর্থাৎ নিজের পরিবার এবং সমাজের ভেতরেও ব্রাহ্মণ্য অভ্যাসের বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে হচ্ছে নিজের আদর্শকে দাঁড় করাতে গিয়ে। যে দুর্গাপুজো হতো মূলত উঁচুবর্ণের জমিদার জোতদার সরকারি আমলাদের বাড়িতে, সেই পুজো নিজের বাড়িতে করে সামাজিক মর্যাদা বাড়াবার কথা ভাবছেন নতুন আমলাতন্ত্রের শরিক হতে উন্মুখ ছেলেরা। উঁচুবর্ণের বাড়ির পুজোতে অন্ত্যজদের প্রবেশ জুটত না, সুতরাং নিজেরা পুজো করে জবাব দেবেন এই ছিল ইচ্ছে। তার উপর শশীভূষণের চার মেয়ের পরে এক ছেলে প্রমথ রঞ্জন জন্মান। সেই আনন্দে তিনি বাড়িতে

দুর্গাপুজোর অনুমতি চাইলে প্রথমে গুরুচাঁদ তা দেন নি। ছেলে অনশন শুরু করলে এবং আরো নানাজনকে দিয়ে চাপে ফেললে বাবা অনুমতি দেন এবং ১৯০২ তে প্রথম ওড়াকান্দির বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়। কল্পতরু ভট্টাচার্য বলে এক ব্রাহ্মণ এসে সেই পুজোর দায়িত্বও নিয়ে নেন। তিনি বুঝি চণ্ডীর আদেশ পেয়েছেন স্বপ্নে।[১৫] এই কথা আবার সগৌরবে লেখেন 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' প্রণেতা তারকচন্দ্র সরকার। এই ঘটনা দেখায়, কোন পথে ব্রাহ্মণ্যবাদ আপসে নামে প্রতিবাদী একটি পন্থার সঙ্গে। ডা মিডের সঙ্গে আলাপের পরে ক'বছর আবার বন্ধ থাকে এই পুজো। কিন্তু আবার পারিবারিক চাপ বাড়ে, ''দশভূজা পূজা মোরা করি পুনরায়, দেবী পুজো হতে তাতে সর্বশক্তি হয়''। গুরুচাঁদ, ''প্রভু বলে এই কার্য আমি না করিব। মরণের ভয়ে শেষে দেবতা ডাকিব''। কিন্তু চাপের কাছে তাঁকে নতিস্বীকার করতে হয়। ১৯১৪ থেকে আবার পুজো চালু হয়। পুজোর তিনদিন তিনি বাড়িতে থাকতেন না, পুজোর কোনও অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন না।

বস্তুর সরলরৈখিক কোনও আন্দোলন হতেও পারে না। সেই বৌদ্ধ ধর্মের দিন থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী সমস্ত ধর্মান্দোলন প্রয়াসেই ভারতে দেখা গেছে তাকে ভেতর থেকেও ব্রাহ্মণ্য ধারার সঙ্গে লড়তে হয়েছে। এবং শেষ অবধি ব্রাহ্মণ্যধারা তাকে গ্রাস করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনেও দেখা গেছে নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তির প্রতিষ্ঠা করে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বকীয়া-বৈধী অভিমতের কাছে আত্মসমর্পণ করলে পরে তাঁর আত্মজ রামচন্দ্র সরে দাঁড়ান মায়ের থেকে। মায়ের গুরু পরম্পরার উত্তরাধিকার বহন করে নসৎ-পুত্র বীরভদ্র। মতুয়া ধর্মে এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল হরিচাঁদের জীবিতাবস্থাতেই। যে 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' গ্রন্থটিকে এখন বহু মতুয়া তাদের আদি ধর্মগ্রন্থ বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ এবং অনুসরণ করে থাকেন, সেটি লিখতে মানা করেছিলেন স্বয়ং হরিচাঁদই। কথাটি এই গ্রন্থেই আছে। তারক চন্দ্র সরকারকে কবি নিযুক্ত করে এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা আসলে করেছিলেন অন্য দুই ধর্মগুরু মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস এবং দশরথ বিশ্বাস। তাঁরা যখন নিজেরাই খানিক লিখে হরিচাঁদকে পড়িয়ে অনুমোদন আনতে যান, তিনি মানা করেন বলেন, ''... লীলাগীতি লেখা এবে উচিৎ না হয় ক্ষান্ত কর লেখালেখি বাহ্য সমাচার।/অন্তরের মাঝে রাখো আসন আমার''। একজন যথার্থ বৌদ্ধ-বাউল সহজিয়া পরম্পরার গুরুর মত নির্দেশ ছিল। জেদ ধরলে হরিচাঁদ

উষ্মা প্রকাশ করেন এই ভাষাতে, ''জান-এ কর্মে পুরস্কার।/কুষ্ঠ ব্যধি হবে চেষ্টা করিলে আবার''। এই ঘটনাতে মৃত্যুঞ্জয়-দশরথ জুটি ভয় পাননি, বইটির অষ্টম সংস্করণের ভূমিকাতে আছে মৃত্যুঞ্জয় বুঝি এই অভিশাপকে সাদরে গ্রহণ করেন, ''সে তো আমার জীবনের লীলাগীতি লেখার পরম পুরস্কার''।[১৬] কিন্তু কবি তারকচন্দ্র সরকার ভয় পেয়ে গেছিলেন। তিনি আধখানা পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে রাখেন। পরে যখন শেষ করেন তখন এক ব্রাহ্মণ্য গল্প জুড়ে দেন, সেই পাণ্ডুলিপি বুঝি সরিয়ে ফেলেছিলেন দেবী সরস্বতী। হরিচাঁদের মৃত্যুর পরে আবার সেই সরস্বতী স্বপ্নে এসে তাঁকে পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিয়ে যান, সেই সঙ্গে গ্রন্থ শেষ করবার জন্যে হরিচাঁদের ইচ্ছে জানিয়ে যান। তাতেও 'মূঢ়মতি' তারক খুব উৎসাহ দেখান না লেখা শেষ করতে। শেষে মৃত্যুঞ্জয়-দশরথদের সহযোগী গোলক গোঁসাই এসে জানান, ''স্বপনেতে কেহ যদি পুঁথি করে দান/সে জন পণ্ডিত হয় পুরাণে প্রমাণ''। আরও জানান, তারকনাথের প্রতি ব্রাহ্মণদের সমর্থন আছে, ''ইতিনায় ভট্টাচার্য পাড়া হয় গান/সুকবি বলে তোরে দিয়াছে আখ্যান''। এতসবেও যখন তারকনাথ সাহসী হন না, তখন গোলক গোঁসাই এক ভোর রাতে রীতিমত নৃসিংহ রূপে এসে তারকনাথের বুকে নখ ঢুকিয়ে শাসিয়ে দিলেন, ''... বলে তোরে নখে চিরি করি খান খান।/নৈলে 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' পুঁথি আন''। বোঝা যায়, ইতিমধ্যে মতুয়া ধর্মের জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে যারা আখের গোছাতে চাইছিলেন তাঁরা এর রাজনৈতিক সারবস্তুকে বিসর্জন দিয়ে একেবারেই ব্রাহ্মণ্যধারার গুরু হয়ে বসতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাঁরাই প্রবল চাপে এই গ্রন্থ লেখান। আজ অনেক মতুয়া ধর্মাবলম্বী বুদ্ধিজীবীরা একে 'স্বগোষ্ঠীর প্রতি অমার্জনীয় অপরাধ' বলে মনে করছেন। এবং নতুন করে ভাবছেন।[১৭] এতো গেল ভেতর থেকে 'ব্রাহ্মণ্যবাদী' চাপের কথা।

বড়মা বীনাপাণি দেবী

কিন্তু বাইরে থেকে যে চাপ ছিল, সেটি আরও ভীষণ এবং আরো লজ্জার। হরিচাঁদের জীবিতাবস্থাতে বইটি ছাপার মুখ দেখেনি। তিনি মারা যান ১৯১৪ তে। ১৯১৬ তে বইটি ছাপান তাঁর কবিয়াল শিষ্য হরিবর সরকার। সম্প্রতি ২০১০-এ ডা. মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস 'হরি-গুরুচাঁদ চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে', 'হরিচাঁদ তত্ত্বামৃত' নামে একটি বই লিখে বের করেছেন। সেখানে জানা যাচ্ছে, 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' প্রকাশে গুরুচাঁদেরও আপত্তি ছিল, ছেলে শশীভূ

ষণ ঠাকুরের চাপে সম্মতি দেন। ''গুরুচাঁদ সম্মুখেতে আনা হল পুঁথি/ শশীবাবু প্রতি পাতা দেখে পাতি পাতি।।/গুরুচাঁদে পড়ে পড়ে শোনালো এ গ্রন্থ।/গ্রন্থের বন্দনা থেকে একেবারে অন্ত।।/পড়া শুনে গুরুচাঁদ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।/কিছু কিছু ভাবতত্ত্বে হইল হতাশ।। ... লেখা যায় যাহা ইচ্ছা সাদা কাগজে।/কালি লেখা কাগজেতে লেখে কিবা মতে।।/সেইমত ভুল তত্ত্ব শেখে যদি জাতি।/ কোনওদিনও কাটিবে না এ আঁধার রাতি।।/ ঠিক তত্ত্ব বুঝানো তো হবে বড় দায়।/ আমি সারা হই ভেবে সেই আশঙ্কায়''। বইটিতে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ-এর 'মতুয়া' তত্ত্ব ছিল না তা নয়, কিন্তু আদিঅন্ত 'বৈদিক অলীক গল্প'-এর মিশেল রয়েছে। তার উপর সমস্যা হলো তখন অবধি যদিও 'নমশূদ্র সুরিৎ' এর মতো বহু সাময়িক কাগজ বেরোচ্ছে নানা কেন্দ্র থেকে, তারকচন্দ্রের মতো সম্মানিত কবি ছিলেন না সমাজে। সুতরাং ভবিষ্যৎ লেখকেরা এর থেকে সত্যিকার কাঠামো একটা দাঁড় করিয়ে দেবেন এই আশাতে গুরুচাঁদ সম্মতি দিয়ে দেন। বাপ-ছেলেতে কথা হয় এরকমঃ ''শশী বলে গ্রন্থে বাবা ধোঁয়া যদি রয়।/গুরুচাঁদ বলে অগ্নি খুঁজিবে নিশ্চয়।।/শশী বলে থাকে থাক কিছু জল অংশ।/গুরুচাঁদ বলে ছেঁকে খাবে রাজহংস''।।[১৮] বইটির প্রকাশিকা অনিতা বিশ্বাস তারকচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিয়েই লিখছেন, প্রবল দারিদ্র্যে তাঁর শৈশব কেটেছে। কবিয়াল পরিবারে জন্মেছেন। বৈদিক কথিকা পাঠ আর গান করেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তার উপর নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। হরিচাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের পরেই তাঁর মধ্যে যে বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব শুরু হয় তার ছাপ রয়েছে বইটির পাতায় পাতায়। এই দ্বন্দ্বের জন্যই বইটি লিখতে তাঁর এতো দ্বিধা ছিল। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপির উপরে কলম চালাতে হয়েছিল সম্পাদক হরিবর সরকারকেও। শ্রীগোপাল বলে এক ভক্ত টাকার যোগান ধরলে হরিবর সরকার কলকাতার প্রেসে প্রেসে ঘোরেন বইটি ছাপাবার জন্য। কিন্তু কেউই রাজি হয় না। অনেকে এর 'বেদ-ব্রাহ্মণ সম্মত' সংস্কার করে আনতে পরামর্শ দেন। ''কোলকাতা প্রতি প্রেসে অনুরোধ।/সর্বস্থানে পান তিনি সম প্রতিরোধ।।/ প্রচারে বৈদিক শাস্তর ছিল যে সমিতি।/ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সপ্তসতী স্মৃতি।।/ইহাদের ছাড়পত্র আগে প্রয়োজন।/তবেই করিবে প্রেস এ গ্রন্থ মুদ্রণ''।। সমিতিটির নাম লেখেননি ডাঃ মনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস । কিন্তু তাঁরা অনুমতি দেন নি, ''... নিষেধাজ্ঞা জারি করে গ্রন্থ ছাপিবারে।।/চিহ্নিত করিল গ্রন্থে বহু জায়গায়।/ বলে আগে এই সকলি কর সংস্কার।।/ বৌদ্ধতত্ত্ব বুদ্ধকথা না থাকে পুঁথিতে।/ অবৈদিক ভাবধারা হইবে মুছিতে''।। বিবেকানন্দ

বলছিলেন, শূদ্রদের সংস্কৃত অধ্যয়নে মানা করেছে কে? তাঁর মৃত্যুর পরেও নবজাগৃত মহানগর কলকাতার ছাপাখানাগুলোর বাস্তবে ছিল এমনি অবস্থান। বিপাকে পড়ে হরিবর সরকার গেলেন শ্রীগোপালের সঙ্গে শলা করতে। আম ছাড়া আমসত্ত্ব কী করে তৈরি করবেন তিনি? শ্রীগোপাল টাকা দিতে পারেন, কিন্তু তাঁরও অবদমিত সামাজিক অবস্থান বোঝা যায় এই উক্তিতে, ''পড়িয়াছি হেন ফাঁদে উপায় তো নাই।।/কিছু কিছু জায়গায় কর সংস্কার।/দৃষ্টিমাত্রে দৃষ্ট হয় হেন দরকার।। স্থূলের ভাবভঙ্গি রাখিও বৈদিক।/সূক্ষ্মভাবে ঠিক রেখো অবৈদিক দিক।।/ভাবীকালে সত্য ঠিক খুঁজিবে পাঠক।/জাতি মাঝে জন্ম লবে তাত্ত্বিক রচক''।।[১৯] সুতরাং যা দাঁড়ালো, ''... লীলামৃতে বহুস্থান সংস্কার করে।।/অলীকের গল্প যাহা গ্রন্থে দেখা দিল।/ পরিস্থিতি চাপে সব প্রক্ষিপ্ত হইল''।। এতো সব করবার পরেও যে প্রেস বইটি ছেপেছিল তার ম্যানেজার তাঁদের থেকে কুড়ি টাকা ঘুষ নিয়েছিল। সত্যি সত্যি শ্রীগোপাল এই সূক্ষ্মভাবে 'অবৈদিক দিক' ঠিক রাখার কথাগুলোই বলেছিলেন কিনা, আজ আর আমাদের জানবার উপায় নেই। কিন্তু একুশ শতকে এসেও যখন একজন নবীন 'তাত্ত্বিক রচক'-এর কলমে এই কথাগুলো পড়ি, তখন মনে তো হয়ই আমাদের 'অন্ধ্ব অন্ধকার মধ্যযুগ'-এর বিরুদ্ধে যত ধিক্কার, 'আলোকিত আধুনিকতা' নিয়ে যত বড়াই কিংবা তাত্ত্বিক কচকচানি সবই আসলে পশ্চিমা আদলে নিজেদের স্বার্থে নির্মিত এক কৃত্রিম আখ্যান। যে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজন হাজার বছর আগেকার বৌদ্ধ কবিদের চর্যাপদের ভাষাকে 'সান্ধ্যভাষা' করে ফেলতে বাধ্য করেছিল, তার থেকে স্থানে এবং কালে খুব বেশি একটা এগোইনি আমরা। বাংলার তথা ভারতের 'নবজাগরণ'-এর দর্প আমাদের মানায় না।

গ্রন্থসূত্র

১. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়;উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতি বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২ -১৯৪৭; জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ; সম্পাদনা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিত দাশগুপ্ত; পৃ ১২৭
২. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়;ঐ; পৃ ১২৯ ৩. ঐ। ৪. ঐ।
৫. অনিতা বিশ্বাস, প্রকাশিকার কথা; ''হরিচাঁদতত্ত্বামৃত'' ডা মনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস; পৃ ১৩
৬. সমুদ্র বিশ্বাস; গ্রামবাংলার জাগরণে মতুয়া আন্দোলন; চেতনা লহর; এপ্রিল-ডিসেম্বর, ২০১৩ যুগ্মসংখ্যা, সম্পাদক অনন্ত আচার্য, কলকাতা, পৃ ১৩৭
৭. The Future of India; Lectures from Colombo to Almora; Complete Works; Volume 3.
৮. Vedanta In Its Application To Indian Life; ঐ।

৯. সমুদ্র বিশ্বাস; গ্রামবাংলার জাগরণে মতুয়া আন্দোলন; চেতনা লহর; এপ্রিল-ডিসেম্বর, ২০১৩ যুগ্মসংখ্যা, সম্পাদক অনন্ত আচার্য, কলকাতা, পৃ ১৩৯।

১০. জয়া চ্যাটার্জি; হিন্দু ঐক্য এবং মুসলমান স্বেচ্ছাচার, বাংলা ভাগ হলো; দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা; পৃ ২২৬।

১১. সমুদ্র বিশ্বাস; ঐ পৃ ১৪১।

১২. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়; ঐ, পৃ ১৪০।

১৩. শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মতুয়া মিশন।

১৪. শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মতুয়া মিশনের সঠিক ইতিহাস; ঐ।

১৫. সমুদ্র বিশ্বাস, ঐ; পৃ ১৩৩।

১৬. দুলাল কৃষ্ণ বিশ্বাস; শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত এক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক প্রয়াস; প্রসঙ্গ হরিচাঁদ ঠাকুরের নিষেধাজ্ঞা; চেতনা লহর; এপ্রিল-ডিসেম্বর, ২০১৩; সম্পাদক অনন্ত আচার্য; কলকাতা, পৃ ৮৯।

১৭. ঐ; ১০৮।

১৮. হরিচাঁদ তত্ত্বামৃত; ডা মনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস; পৃ ২৪০-৪১।

১৯. ঐ; পৃ ৪২৪-২৫।

হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বনাম মতুয়া মহাসঙ্ঘ

হর্ষবর্দ্ধন চৌধুরী

ভারতে ব্যক্তি পরিচয়ের থেকে বড় জাতি পরিচয়। জাতির ভিত্তিতে একজনের সামাজিক সম্মান, মর্যাদা নির্ধারিত হয়। ভারতের বেশিরভাগ মানুষের ধর্ম হিন্দু ধর্ম। হিন্দু ধর্মের মল ভিত্তি চতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা। বর্ণ অনুযায়ী তার পেশা নির্ধারিত হতো। ধর্মকে যদিও বিশ্বাস (ফেইথ) বলে, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এ নিয়ম চলে না। এখানে জন্মসূত্রে ধর্ম নিরূপিত হয়। আবার এক বর্ণের মধ্যে অনেক ভাগ আছে। ব্রাহ্মণ হলেই যে সবাই একই মর্যাদা পাবে তাও নয়। অগ্রদানী ব্রাহ্মণের কথা আমরা জানি। তবে চতুর্বর্ণের মধ্যে সব থেকে খারাপ অবস্থা চতুর্থ বর্ণের অর্থাৎ শূদ্রদের। মহাভারতে গীতায় এদের জ্ঞানচর্চা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ রাখা, অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ। উপরের অগ এসর জাতিদের সেবা করাতেই এদের মুক্তি। অর্থাৎ এদের মজুরী চাওয়ার অধিকারও নেই। এই চতুর্থ বর্ণের জনগোষ্ঠীর লোকেরা কঠোর কায়িক শ্রম করে সম্পদ (খাদ্যদ্রব্য, পোষাক, যন্ত্রপাতি, অলঙ্কার ইত্যাদি) উৎপাদন করত। আর বৈশ্যরা যাদের এক সময় চাষ করার কথা ছিল তারা চাষবাস ছেড়ে এদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি করে অধিক লাভ অর্জন করত। তাদের সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য এক শ্রেণির লোকের দরকার পড়ল সেই জাতির নাম হলো ক্ষত্রিয়। এই ক্ষত্রিয়রা আবার পররাজ্যের গরু, নারী ও সম্পদ লুঠ করত। এই লুঠেরাদের কাজকে ধর্মীয় আখ্যা দিত ব্রাহ্মণরা রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে। তার বিনিময়ে তারা পেত লুঠের বখরা বা দক্ষিণা। এই শ্রেণির নাম হলো ব্রাহ্মণ। এদের বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত। যেমন মহাভারতের চার্বাক। প্রাচীন কালে তারাই ছিল আইন প্রণেতা। এরাই হতো রাজার প্রধানমন্ত্রী। তাই যখনই কোন বিদেশী ভারত আক্রমণ করেছে এরা সেই আক্রমণকারীকে সাহায্য করেছে। টাকা খেয়ে শকদের ব্রাহ্মণ বানিয়েছে, হুনদের ক্ষত্রিয়। তাই ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কোন গোত্র নাই তবে কী

ভারতের সবাই ব্রাহ্মণের সন্তান? এই ব্যবস্থার নাম ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা।

এই অমানবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে এই ব্যবস্থা শুরুর সময় থেকেই। চার্বাক, আজীবক, অজিত কেশকম্বল, বুদ্ধ কিছু উল্লেখযোগ্য নাম। কিন্তু রাজা চায় শোষণ, মানবিকতা তাদের পছন্দ নয়। তাই রাজারা ব্রাহ্মণদেরকেই প্রশ্রয় দেয়। মুসলিম আগমনের পূর্বের ইতিহাস ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধদের লড়াইয়ের ইতিহাস। কিন্তু যখন অস্ত্র বলে বলীয়ান ও জাতিপ্রথাহীন মানবিক ধর্মের মুসলমানরা ভারত আক্রমণ করল তখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের অত্যাচারে কোনঠাসা বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। সেই ধর্মান্তরণ ঠেকাতে উদয় হল ভক্তি মার্গের। রামানন্দ কবীরকে শিষ্য করলেন। বাঙলায় চৈতন্য হরিদাসকে বুকে টেনে নিলেন। কিন্তু চৈতন্য মারা যেতেই বৈষ্ণব ধর্মে জাতিপ্রথা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পতিতরা খুঁজতে লাগল তাদের পাবনকারীকে।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দী গ্রামে পতিত জাতির মধ্যে সর্বাধিক জনসংখ্যার গোষ্ঠী নমশূদ্র (তখন বলা হত চণ্ডাল) পরিবারে জন্ম নিলেন হরিদাস। যিনি আত্মসম্মানে বলিয়ান করে তুলতে চাইলেন এই জাতিকে। অস্বীকার করলেন ব্রাহ্মণ্য বিধিকে। নতুন এক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন-- মতুয়া ধর্ম। আর এই হরিদাসের মা ছিলেন চৌধুরী পরিবারের মেয়ে। ওড়াকান্দীর চৌধুরীরা হারিদাস (পরে হরিচাঁদ নামে পরিচিত) ও গুরুচাঁদের কর্মকাণ্ডের শরিক ছিলেন। আমি এই চৌধুরী পরিবারের সন্তান হয়ে এই আন্দোলন সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হলাম। আমি খুঁজতে থাকলাম নমশূদ্রদের ইতিহাস। কবে থেকে তারা পতিত হল? তারা পরিচিত ছিল চণ্ডাল নামে। তাদের ঘৃণা করা হতো কেন? মর্যাদার লড়াই কবে কীভাবে চালিত হলো? মতুয়া দর্শন কী? মতুয়া দর্শনের কী প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য বিরোধী? গুরুচাঁদের লড়াই-- ১৮৭২ এর ধর্মঘট, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অগ্রসর জাতির সাথে অসহযোগিতা, পতিতজাতি ও মুসলিম ঐক্য, অর্থনৈতিক উন্নতি, শিক্ষা, সরকারি চাকরি, চাণ্ডাল নাম মোক্ষণ, (এটা কি আদৌ মর্যাদার বৃদ্ধি?) ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পতিতদের মুক্তির লড়াই কেমন ছিল। আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা-- কৃষি, শিল্প শ্রমিক আন্দোলনে ভাগ, তেভাগা আন্দোলন।

হরিচাঁদ ঠাকুর

হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রপিতামহ নিধিরাম বিশ্বাস গোপালগঞ্জের সফলীডাঙায় এসে বসতি স্থাপন করে। তার ছেলে মুকুন্দরাম তার ছেলে যশোবন্ত। 'যশোবন্তের প্রকৃত গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন এবং সেই কালে ফরিদপুরের এই অঞ্চলের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ধনী এবং সম্মানী ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি মধুমতী নদীর পূর্বতীরস্থ তরাইল গ্রাম নিবাসী রামপ্রসাদ চৌধুরীর কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রমনী অশেষ গুণসম্পন্না এবং কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ ছিলেন। তাহার গর্ভে পাঁচ পুত্র কৃষ্ণদাস, হরিদাস, বৈষ্ণবদাস, গৌরীদাস ও স্বরূপদাস এবং দুই কন্যা জাহ্নবী ও মালিনী জন্মগ্রহণ করেন।' (প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের আত্মকথা/১৯৯৫/পৃ-৭৬)

জন্মঃ-- কৃষ্ণদাসের জন্মের নয় বৎসরের মধ্যে যশোবন্তের আর কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। সেজন্য অন্নপূর্ণাদেবী নিতান্ত দুঃখিতা ছিলেন। --অবশেষে মুখডোবা নিবাসী রামকান্ত গোস্বামী তিনি শ্রীশ্রী বাসুদেব জিউর পূজার্চনা করিতেন এবং সঙ্গে বাসুদেবের বিগ্রহ রাখিতেন। (ঐ বিগ্রহ পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণকালে শ্রীশ্রী চৈতন্য স্বয়ং মুখডোবা গ্রামে স্থাপন করিয়াছিলেন)। একদিন রমাকান্ত যশোবন্তের বাড়িতে আসলে যশোবন্ত ও অন্নপূর্ণা তাঁর খুব সেবা করেন এবং মনের বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। --রামকান্ত হৃষ্টচিত্তে বাসুদেব জীউকে তাহার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিলেন-- এই বাসুদেব স্বয়ং তোমার উদরে জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহার এক বৎসর পর ১২১৮ বঙ্গাব্দে-- পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল ইহার নাম রাখঅ হইল হরিদাস।

হরিদাসের জন্মের পর আরও তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তারা বড় হলে যশোবন্ত মারা যান তখন সংসারের দায়িত্ব কৃষ্ণদাসের উপর এসে পড়ে। (প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের আত্মকথা/১৯৯৫/পৃ-৭৮)

ছেলেবেলা

হরিদাস কিন্তু বেশি সাহসী, যুক্তিবাদী ও বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। জন্ম ১৮১২ সালের ১১ মার্চ। তার বাবা ছিলেন পরম বৈষ্ণব ভক্ত। একদিন বাড়িতে কিছু বৈষ্ণব এসেছিল, যশবন্ত তাদের সাথে কীর্ত্তনে মত্ত, এদিকে চার বছর বয়সের বৈষ্ণবদাস, গায়ে অল্প জ্বর, হাঁটতে হাঁটতে পুকুরে গিয়ে জলে ডুবল। মা অন্নপূর্ণা তাকে তুলে নিয়ে ঘরে এনে কাঁদতে কাঁদতে যশোবন্তকে জানায়, তখন কীর্ত্তন হচ্ছে। যশোবন্ত তাঁর বৌ-এর মুখ চাপা দিয়ে দিয়ে কাঁদতে বারণ করে। কাঁদলে বৈষ্ণব সেবায় বিঘ্ন হবে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে অন্নপূর্ণা

আর নিজেকে সামলাতে না পেরে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। তখন যশোবন্ত চৌকির তলা থেকে ছেলেকে বার করে মাথায় নিয়ে নাচতে থাকে যে তার ছেলের মৃত্যু তার বৈষ্ণব সেবায় বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। এই ঘটনা ছয় বছরের ছেলে হরিদাসের মনে বসে যায়। ছেলের মৃত্যুর চেয়ে বৈষ্ণব সেবা বড় হতে পারে! বৈষ্ণবদের উপর তার ক্ষোভ জমতে থাকে। পড়াশোনার বালাই নেই, বালক হরিদাস মাঠে বন্ধুদের সাথে খেলে বেড়ায়। পালাগান, পদ্মপুরাণ শোনে। অদ্ভুৎ শ্রুতিধর, দৌড়ে গিয়ে সাপ ধরতেন, গরুদের নাচাতেন।

সফলডাঙ্গা থেকে ওড়াকান্দি যাত্রা

সফলডাঙ্গার জমিদার সূর্যমনি মজুমদার ও পার্ব্বতীচরণ মজুমদারের জমিদারীর বাৎসরিক সদর-কর বাকী পড়ে। দেশে তখন আকাল। ভালো কর আদায় না হওয়ায় তারা গোমস্তাকে হরিদাসের বড় ভাই কৃষ্ণদাসের কাছে পাঠায়। সাতশত টাকা ধার চায়। আজ থেকে দুশো বছর আগে সাতশো টাকা, যখন একটা সাধারণ পরিবারে দু'টাকায় সংসার চলে যেত। স্বভাব উদার কৃষ্ণদাস সহজ বিশ্বাসে সেই টাকা ধার দেয়। কথা ছিল পৌষমাসে শোধ দেবে। কিন্তু জমিদার সে টাকা শোধ দেবার নাম করে না। কৃষ্ণদাস টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে। শেষে একদিন দু'চার কথা শুনিয়ে দেয়। গোমস্তা সেই কথা বাড়িয়ে জমিদারকে বলে। জমিদার নৌকা চড়ে পেয়াদা নিয়ে সফলডাঙা আসে, গোমস্তাকে পাঠায় কৃষ্ণদাসকে ধরে আনতে বলে, কৃষ্ণদাস তখন গাঁজায় দম দিয়ে মেজাজে ছিল, ভাবল জমিদার তার টাকা ফেরৎ দিতে এসেছে। কিন্তু জমিদার তাঁকে বকেয়া কর দিতে বললে, কৃষ্ণদাস বলে, আগে ধারের টাকা ফেরত দাও। জমিদারী মেজাজ। পেয়াদাকে বলে কৃষ্ণদাসকে ধরে উত্তম-মধ্যম দিতে। এতে পাঁচ ভাই মিলে পেয়াদাকে তো পেটায়ই বরং যখন জমিদারকে পেটাতে যায় তখন কৃষ্ণদাসের মা অন্নপূর্ণা জমিদারকে মারতে নিষেধ করে। জমিদার মামলা করে কৃষ্ণদাসদের উৎখাত করে।

সে সময়ে জমিদারেরা প্রধান প্রজাকে বন্ধক রেখে অন্য বড় জমিদারের কাছ থেকে অন্য গ্রামের ইজারা নিত। ঐ ইজারা প্রদত্ত গ্রাম থেকে প্রধান প্রজা বিশেষ লাভবান হতেন। কৃষ্ণদাস সেনাজদিয়া গ্রামের জামিন ছিলেন ঐ গ্রামের কর বাকী পড়ায় মালিক কর্তৃক ১৪ হাজার টাকার ডিক্রি হয়। কৃষ্ণদাস এই করের বোঝা বইতে পারলেন না। ফলে তাদের সম্পত্তি ক্রোক হয়। ১২৫০ বঙ্গাব্দে সেখান থেকে উঠে এসে কৃষ্ণদাসরা ওড়াকান্দির ভজরাম চৌধুরীর

বাড়িতে ওঠেন।

চৌধুরী পরিবারের কুবের চৌধুরী তাঁর জ্যেষ্ঠ ও খুল্লতাত ভ্রাতা দলুই ও তুলারাম ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ফুকুরা থেকে সফলীডাঙায় ঘর তৈরি করে বাস করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ওই পরগণার জমিদারের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারাও উত্তর দিকের ওড়াকান্দী গ্রামে চলে আসেন। তাঁরা এখানে তেলিহাটি পরগণার জমিদার নড়াইলের রতন বাবুর কাছ থেকে কিছু আবাদ উপযোগী জমি বন্দোবস্ত করে নেন। এই গ্রামে আগে থাকতেই দাস, টিকাদার পরিবারের লোকেরা বসবাস করতেন। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। রামচাঁদ চৌধুরীর সাথে হরি ঠাকুর সাধন ভজন করতেন। তাতে হরি ঠাকুর সিদ্ধ হন ও অলৌকিক শক্তি অর্জন করেন। উক্ত চৌধুরী মহাশয় ও নাকি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তবে তিনি জাহির করিবার ভয়ে প্রকাশ করেন নাই।

বিবাহ--

জিকাবাড়ি নিবাসী লোচন প্রামানিকের একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীমাতা। লক্ষ্মী বড় হলে লোচন সফলা এসে যশোমন্তের কাছে হরিচাঁদের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করে। যশোমন্ত পাঁচ ছেলের বিয়ে দিয়ে নিজেও ধরাধাম ত্যাগ করলেন।

সন্তান--

তাঁর দুই ছেলে গুরুচরণ ও উমাচরণ। গুরুচরণের জন্ম ১২৫৩ বঙ্গাব্দ বা ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ। শেষ জীবনে তিনি সর্বত্যাগী হয়েছিলেন। অর্থ তিনি ছুঁতেন না। তিনি যেখানে বসতেন সেখানে প্রচুর টাকা ভক্তরা এনে দিত। তিনি শেষ জীবনে ঘরে থেকেই সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করতেন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে ২শে ফাল্গুন (১৮৭৮ সালের ৬ই মার্চ) বুধবার ৬৬ বছর বয়সে হরিচাঁদ ঠাকুর ওড়াকান্দি গ্রামে প্রয়াত হন।

ধর্ম্ম--

রাজশেখর বসু হিন্দু ধর্মকে ধর্ম বলে মানতে চাননি। কারণ তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইসলাম এদেরকে রাজশেখরবাবু ধর্ম বলেছেন কারণ এদের নির্দিষ্ট ধর্ম প্রবর্তক আছে। আর নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে যা এক ধর্মকে অন্য ধর্ম থেকে আলাদা করে। কিন্তু ধর্ম ছাড়া ভারতে যারা নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করে তাদের মূলত পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন

অক্ষয় কুমার দত্ত, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'। যেমন বৈষ্ণব যারা বিষ্ণু ও তাঁর অবতারের ভক্ত, শৈব-শিব ভক্ত, শাক্ত-শক্তি অর্থাৎ কালী ও তার একান্ন পিঠের উপাসক, সৌর-সূর্যের উপাসক এবং গণপৎ বা গণেশের উপাসক। পারিবারিক দিক দিয়ে হরিঠাকুর বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে তার মত তার ভক্তদের বিশ্বাস করতে সাহায্য করেছে যে হরিচাঁদের মত 'মতুয়া' বৈষ্ণব মত নয়। এরা একাট স্বতন্ত্র ধর্ম। এখানে আমরা হরিচাঁদের মতের সাথে পরিচিত হব তাঁর সাথে অস্পৃশ্য বলে যাঁদের গণ্য করা হতো তাঁরাও ধর্মগুরু হয়ে উঠছেন এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে বলছেন এমন সব মতের সাথে পরিচয় করাব। আগে দেখে নি হরিচাঁদের মত কি! এই জন্য সাহায্য নিচ্ছি তারক সরকারের 'হরিলীলামৃত' ও তার প্রপৌত্র প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের 'আত্মকথা'র।

'বৈষ্ণব ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহাতে সন্দেহ নাই এবং শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব জাতিভেদপ্রথা এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রাম চালাইয়া হরিনামে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সাম্যবাদ প্রচার করিলেও তাহার অন্তর্ধানের পর বৈষ্ণব ভক্তগণের মধ্যে আবার জাতিভেদ দেখা দিল। এবং বাউল এবং অন্যান্য প্রকারের অতিশয় নিকৃষ্ট অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । ইহারা পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ প্রকারের জঘন্য আচরণে এবং অনুষ্ঠানে অনুক্ষণ মত্ত থাকিত এবং ইহাকে তাহারা অতি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব প্রেম ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিত'। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের আত্মকথা/১৯৯৫/পৃ ১০১।

তিনি দেখলেন ধর্মের নামে এই দুরাচারের সাথে লড়াই করতে এক নতুন ধর্মের অবতারণা করতে হবে। কিন্তু নতুন কোনও কথা বলতে গেলে সহজে লোকে কেন বিশ্বাস করবে? তাই তিনি জনসেবা, স্বাস্থ সচেতনার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস অর্জন করলেন। আস্তে আস্তে তার কথা লোকে শুনতে শুরু করল। কি তার কথা---

গৃহে থাকি প্রেম ভক্তি সেই হয় শ্রেষ্ঠ; গৃহধর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়; যত যত তীর্থ আছে অবনী ভিতরে, সত্য বাক্য সমকক্ষ হইতে না পারে।/দেহের ইন্দ্রিয় বশ না হয়েছে যার/তীর্থে গেলে ফলপ্রাপ্তি না হইবে তার। সোজা কথায় সত্যি কথা, গৃহ ধর্ম, সংযত জীবনকেই হরিদাস ধর্ম বলেছেন (হরিলীলামৃত, পৃ-৩২)।

ধর্ম সম্পর্কে এতাবৎ কালের বিশ্বাস প্রেম, সত্য, ষড় রিপু, গার্হস্থ্য ধর্মের

সাথে তিনি যোগ করলেন তীর্থ যাত্রার অপ্রয়োজনীয়তা। প্রসঙ্গত বলি, ওড়াকান্দি নামের উৎপত্তির কথা। উড়িষ্যা থেকে কিছু উৎকলবাসী এখানে এসে উঠত এবং অনেক লোক জোগাড় করে পুরীতে তীর্থ করতে নিয়ে যেত। এই ভাবে অর্থ উপার্জন করত। তীর্থ করতে গিয়ে অযথা অর্থ ব্যয় ও কাজ নষ্ট হতো। আর বৈষ্ণবরাও তখন তীর্থযাত্রার নাম করে অর্থোপার্জন শুরু করেছে। এমনকি রামমোহন পর্যন্ত তীর্থযাত্রা ও মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে লিখেছেন (১৮১৭ সালে ভট্টাচার্যের সাথে বিচার), 'যেসকল ব্যক্তি তীর্থ গমনের অধিকারী তাহারাই মূর্তি পূজার অধিকারী অতএব তাহারা যদি তীর্থ গিয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায় তবে সুতরাং তাহাদের তীর্থ গমনের অভিলাষাদি থাকবেন না এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে' (রামমোহন রচনাবলী ১৯৭৩)।

তিনি আর কি বলছেন। সত্যবাদী হলেও কাজ হবে না। তৃতীয় তরঙ্গে দশোরথোপাখ্যানে দেখি---

দশরথ নামে সাধু পদ্মবিলা বাসী। তত্ত্বজ্ঞানী হরিনাম মত্ত অহর্নিশি। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ রতন। করে একাদশীব্রত তুলসী সেবন। তিনসন্ধ্যা মালা জপ তিলক ধারণ। হরিনাম ছাপা অঙ্গে অতি সুশোভন। নিত্য নিত্য প্রতাঃকৃত্য স্নানাদি তর্পণ। গুরুপূজা কৃষ্ণ পূজা নৈবেদ্য অর্পণ। পক্ষে পক্ষে একাদশী শ্রীহরি বাসর। স্তব পাঠ নাম পাঠ নাহি অবসর। চৈতন্যতরিতামৃত পঠে ভক্ষে দিনে একবার। রাত্রে কিছু ফলাহার কভু অনাহার।

এহেন ভক্তের পালাজ্বর শুরু হলো। কয়েকমাস ধরে ভুগলেন ভাল ভাল বৈদ্য দেখিয়ে কোনও ফল হলো না। শেষে অনেকের কথায় ওড়াকান্দির হরিদাসের কাছে এলেন। হরিদাস তাকে যা বললেন, সেটা একটু শোনা যাক---

'তুইত বিশ্বাস; আমি বড় অবিশ্বাস। তন্ত্রে-মন্ত্রে শৌচাচারে না হয় বিশ্বাস। ... স্নান পূজা সন্ধ্যাহ্নিক মোর নাহি ঠিক। কুকুরের উচ্ছিষ্ট পেলে খাই। বেদবিধি শৌচাচার নাহি মানি ঠাঁই।' হরিদাস দশরথকে চান না করে পান্তা ভাত খেতে বললেন। এবং সেই ভাত খেয়ে তার জ্বর ছেড়ে গেল। এ দেখি কোনও শাস্ত্র শাসিত নিয়ম নয়। শরীরের নিজস্ব ধর্মের উপদেশ, যা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের অনুকরণ নয় বরং হাজার বছর ধরে বাংলার গ্রামের যে শিক্ষা তারই প্রয়োগ। আরো বিস্ফোরক মন্তব্য পাই মহানন্দের গুরুচাঁদ চরিতে (পৃ-৭০, গুরুচাঁদ) নাহি দেবদেবী পূজা দীক্ষা শূন্য মহাতেজা।

বুদ্ধের পর সম্ভবত হরিচাঁদ এই বিস্ফোরক মত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু বৈপ্লবিক মত থাকলেই হবে না, সেটা প্রচার এবং প্রয়োগ দরকার। সেই কাজ করলেন তার ছেলে গুরুচরণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে (খ্রী ১৮৪৬, ১৩ মার্চ)। হরিচাঁদ মারা যান ১৮৭৮, ৬ মার্চ-এ।

গুরুচাঁদ ঠাকুর

শিক্ষা একটু বড় হইলে হরিদাস গুরুচরণকে পদ্মবিলা গ্রামে দশরথ বিশ্বাসের বাড়ি পড়ার জন্য পাঠান। পরে মল্লকাঁদি, সাধুহাটি, দেবাসুর প্রভৃতি গ্রামে থেকে তিনি পড়াশোনা করেন। কিছুদিন আড়কান্দি গ্রামের সর্দার পাড়ায় মোক্তাবে পার্শি শিক্ষা করেছিলেন। কোর্ট কাছারিতে সেই সময় পার্শি ভাষা চলিত। তিনি অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। আমি পিতামহের হস্তলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ দেখিয়াছি। উহার একখানি আমাদের আলমারিতে দীর্ঘকাল বর্তমান ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পরে উহা আর পশ্চিমবঙ্গে আনয়নে সমর্থ হন নাই (প্রমথ/আত্মকথা/পৃ-৮৫)।

তিনি বাংলা ভাষা ভালই জানিতেন এবং বুঝিতেন। তৎকালীন প্রকাশিত বহু বাংলা পুস্তক পড়িয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে বাংলা সংবাদপত্রের তিনি গ্রাহক হইয়া তাহাও রীতিমত পাঠ করিতেন। পিতামহের নিকট বাল্যকালে আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়নের কথা প্রভৃতি শুনিতাম।

নমশূদ্র ঘরের ছেলে গুরুচাঁদ। নমশূদ্রের ঘরের কথা জানেন। তাঁদের কিভাবে ঠকাচ্ছে ধর্মের নাম করে। তারা পরিশ্রম করে ফসল ফলায়, মাছ ধরে, কাপড় বোনে। তার বিনিময়ে যা পায় তাতে তার ঘরের অভাব মেটে না। অথচ তাকে বলা হচ্ছে ত্যাগ করতে। এতো বড় প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে কেউ কোনও কথা বলে না। অর্থ না থাকলে সমাজে সম্মান থাকে না। বাবা হরিচাঁদের অনেক ভক্ত। শ্রদ্ধাভরে কেউ কিছু না কিছু নিয়ে আসে। কিন্তু হরিচাঁদের সেদিকে নজর নেই। পরিশ্রম করে অর্থোপার্জনের কথা তিনি বলে আসছেন। বাবার শিষ্যরা বাবার কাছে অনেক কিছু প্রণামী দেয় কিন্তু ভক্তের দানে জীবনধারণ করা সৎ মানুষের কাজ নয়। (ভক্তগণ কত দ্রব্য হরিচাঁদে দেয়। তার প্রতি হরিচাঁদ দৃষ্টি নাহি দেয়।/ভক্ত দত্ত দ্রব্য প্রতি কভু দৃষ্টি নাই। কায়ক্লেশে আনি অর্থ সদা ভাবে তাই) (গুরুচাঁদ/পৃ-৫৬)। তাই তিনি সেটা বুঝে অর্থোপার্জনের

উপায় খুঁজতে লাগলেন।

ওড়াকান্দিতে কিভাবে ধন উপার্জন করা যায়, গুরুচাঁদ ভাবতে লাগলেন।

ওড়াকান্দি বিলে ভরা জলা দেশ। বছরে বেশিরভাগ খাল-বিল জলে ভরা থাকে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বড় অভাব। সবই বাইরে থেকে আনতে হয়। আর ওড়াকান্দিতে উৎপন্ন পাট, ধান, সরষে বাইরে চালান হয়। এই চালানি আর আমদানি করে অনেকে ধনী হয়ে উঠলো. মল্লকান্দির অধিবাসীদের হরিচাঁদ উপদেশ দেওয়ার সময় সেই কথা গুরুচাঁদের কানে গেল। কুড়ি বছর বয়সের গুরুচাঁদ মল্লকান্দির গিরি কীর্তনীয়াকে ধরল, সাথে গেল একই গ্রামের নীলকান্ত চৌধুরী। নৌকো তৈরি হলো। হরিচাঁদ ছেলেকে একা ছাড়তে চান না। তাঁর শিষ্য তালতলার মহেশ বিশ্বাসকে ব্যবসা দেখাশুনা করার দায়িত্ব দিলেন। দশবছর বাণিজ্য করে প্রচুর লাভ হলো।

আসাম থেকে কাঠ এনে টিনের চাল দিয়ে ঘর তৈরি করলেন। এসব দেখে হরিচাঁদ খুব খুশি। কিছুদিন পরে নড়াইলের শ্রীনাথ সরকার জমি বন্দোবস্ত করতে ওড়াকান্দি আসে তাতে প্রজারা ক্ষুব্ধ হয়, তারা জমি খাস রাখতে চায়। (প্রসঙ্গত, সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় ঝড়ে জনশূন্য হয়ে পড়ে। তার উপর মগ ও পর্তুগীজরা সমুদ্র উপকল এলাকা থেকে লোক ধরে নিয়ে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করত। সীতারাম রায় তাদের দমন করে। পরে ইংরেজ এসে ১৮৪৩ সালে ক্রীতদাস প্রথা বেআইনি করে। তারপর জমিদাররা সেইসব পরিত্যক্ত জমিতে কেউ বসতি স্থাপন করলে সেখানে উৎপাদিত শষ্যের উপর কোনও কর নিত না। এই জমিকে খাস জমি বলা হতো)। শ্রীনাথ ভাবল জমিদার দয়ালু। হয়তো কর মাফ করে দেবে। তাই জমিদারের কাছে না গিয়ে মহকুমা গিয়ে মামলা করে দিল যে সে যখন কর আদায় করতে গিয়েছিল তখন তাকে নমোরা মারধোর করেছে। এই মামলায় আসামী শ্রীগুরুচরণ ঠাকুর আর শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী। বিচারক তদন্তের ভার পুলিশকে দেয়। পুলিশ অভিযুক্তদের কোনও খবর না দিয়ে তাদের ফেরারী ঘোষণা করে। বিচারক ১০০ টাকা কর ধার্য করেন। তখন গুরুচরণ আবেদন করেন যে ভক্তরা তাঁর পিতাকে ধর্মকার্যে যে উপহার দিয়েছিল তার উপর কর নেওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। তবে বাণিজ্য করে যে অর্থ উপার্জন করেছে তার উপর ২০ টাকা কর দিতে রাজী হলেন। গুরুচরণ বুঝতে পারলেন কর দিলে সম্মান বাড়ে। ধন বৃদ্ধিতে সম্মানের বৃদ্ধি হয়। হরিদাসপুরে দোকান খুললেন। যজ্ঞেশ্বর আর রামতনু দুইজন কর্মচারী রাখলেন।

অর্থ

যারা চাষী তারা ব্যবসাকে ভালো চোখে দেখে না। তাদের কাছে গুরুচাঁদ বলছেন--- ব্যবসায় কা'রে বলে শুনহ সকলে।/শুধু দ্রব্য কেনা-বেচা নহে কোনও কালে।/টাকাকড়ি লেনদেন যে যে ভাবে হয়।/ বিনিময় হলে অর্থ ব্যবসায় কয়।।

হ্যাঁ, ব্যবসায়ে খারাপ দিকে আছে বৈকি। সেখান কী কর্তব্য---

(পৃ-৯৮/গুরুচাঁদ) বাণিজ্য সাধুর কর্ম মহাজনে কয়।/মহাজন হলে তার মহামন হয়।।/ মহাজন সাজি করে দুষ্ট ব্যবসায়। ইহকাল পরকাল সব নষ্ট হয়।।/''ব্যবসায়ে লক্ষ্মী লাভ'' সত্য বটে কথা।/ তার মধ্যে রাখা চাই ব্যবসায় কারে শুদ্ধ পবিত্রতা।

ব্যবসায়ে পবিত্রতা কেমন যেন 'সোনার পাথর বাটি'র মত শোনাচ্ছে না? ইনি ধর্মগুরু না আধুনিক ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যাপক? হ্যাঁ, এখানে ওনার কথা বোঝা দরকার। বাণিয়া বা জাতিগত ভাবে যারা ব্যবসায়ী তারা লাভের জন্য মাল লুকিয়ে রাখা, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে কেনা দামের থেকে অনেক বেশি দামে বিক্রি করা ইত্যাদি কাজ করত। ১৯৪৩ সালে এই ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে বাংলার ৩৫ লাখ লোক অনাহারে মারা যায়। নেহেরু বলেছিলেন একজন ব্যবসায়ী একজন মৃত লোকপিছু এক হাজার টাকা আয় করে। গুরুচরণ এই অনৈকতার পথ বর্জনকেই ব্যবসায়ে সততা বলেছিলেন।

শুধু পণ্যের কেনাবেচাই ব্যবসা নয়। অর্থের লেনদেনকেও ব্যবসা বলে। শুধু নিজে ব্যবসা করে ধনী হওয়া নয়, অনেকে অর্থের অভাবে ব্যবসা করতে পারেন না। গুরুচরণ কমসুদে ধার দেওয়া শুরু করলেন। অনেকে এই নিয়ে সমালোচনাও করেন। দেখি ধার নেওয়া সম্বন্ধে গুরুচরণ কী বলছেন--- 'লগ্নি কারবারে প্রভু অর্থকে খাটায়।/ব্যবসায়ী লোক কত আসে প্রভু ঠাঁই'। বলে, ''প্রভু কারবার লাগি অর্থ চাই।।/আপনার টাকা প্রতি সুদ কিছু দিব।/ কারবার করি নিজে লাভবান হব''।।/ঘরে ঘরে সবে যাহে ব্যবসায়ী হয়।/ বাণিজ্য করিতে প্রভু তাই অর্থ দেয়।।/দীনহীন কতজনে অর্থের অভাবে।/ করিত না কৃষিকর্ম 'পারিব না' ভেবে।/সে সবে ডাকিয়া প্রভু কহে কৃপা করি।/ 'অর্থ নিয়ে কৃষি কর অলসতা ছাড়ি'।

এইভাবে গুরুচাঁদ তার সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি একা কতজনকে ধার দেবেন? অন্য মহাজনরা ঋণ গ্রাহককে ঠকায়

কারণ তারা অশিক্ষিত। আবার জমিদার নেয়। অনেকসময় ফসল নষ্ট হয়ে গেলে, বা বিপদে পড়ে অনেকে মহাজনের কাছ থেকে ধার নেয়। আর ঋণগ্রহীতা যদি শিক্ষিত না হয় মহাজন ঠকিয়ে তাকে সর্বস্বান্ত করে। তাই শুধু ধনী হওয়ার জন্য নয়, আত্মরক্ষার জন্যও শিক্ষার দরকার। তিনি সমাজকে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে শুরু করলেন।

শিক্ষা

নমশূদ্রদের দুঃখের অন্যতম কারণ শিক্ষার অভাব। মহানন্দ শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিতে লিখছেন---(পৃ-১০০) সাতে পাঁচে কুড়ি বলি ত্রিশ টাকা হয়/কেনা খ তে টিপসহি বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া। ঋণ শোধ করে শেষে সম্পত্তি বেচিয়া। পেয়াদা এসে বকশিস চায়, নায়েব ছোট জমিদার সেজে অত্যাচার করে। কেউ নেই এদের উদ্ধার করে। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে চৌধুরী বাড়িতে পাঠশালা তৈরি হলো। (গুরুচাঁদ/পৃ-১০৮) শুন স্বজাতির গণ সবে মনোকথা। বিদ্যা শূন্য ধনমান সব জানো বৃথা। নমশূদ্র জাতি যদি বাঁচিবারে চাও। যাক প্রাণ সেও ভালো বিদ্যা শিখে লও। আমি বলি বিদ্যা শূন্য রবে যেই জন। নমশূদ্র বলি তারে বল না কখন।। বিদ্যাবান যেই জন তাঁকে মান্য দাও। বিদ্যার ভিত্তিতে সবে সমাজ গড়াও।

এবার দেখি চৌধুরীদের ইতিবৃত্তে কী লেখা--- (শিক্ষা/পৃ- ৪৯)

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁহারা এই পরিবারের কর্তৃস্থানীয় ছিলেন তাহারা কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানিতেন। এইসময় লেখকের উপরিলিখিত পিতামহ ভজরাম চৌধুরী মহাশয় এই পরিবারের তথা সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৯৫৬ সালে যখন ইংলন্ডের রানী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন সাধারণে জানাইবার জন্য তাঁহার নামে কালেক্টর সাহেব এক ঘোষণাপত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র এই বাড়িতে অনেকদিন রক্ষিত ছিল। তিনিই প্রথম এই বাড়িতে এক উচ্চ প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন (১৮৬০)। এই স্কুল ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত এখানে চলিয়াছিল। তাহাতে পার্শ্ববর্তী ঘৃতকান্দি গ্রামের বৈদ্যনাথ বিশ্বাস নামক এক কায়স্থ ছেলেরাও পড়িতে আসিত। তাহাদের মধ্যে এই বাড়ির এবং গ্রামের অন্যান্যবাড়ির ও ঐ ঘৃতকান্দি গ্রামের কায়স্থ ছেলেরাও পড়িতে আসিত। তাহাদের মধ্যে বানী পাল ও যাদব পাল মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ... এই স্কুলের ছাত্রের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় তাহা এই পরিবারের একটি ছাড়া ভিটিতে ঐ সময় স্থানান্তরিত হইয়া ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পরিণত হয়।

তখন ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ হইতে আগত স্বজাতীয় নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ রঘুনাথ সরকার শিক্ষক হইয়া আসেন। তাঁহার নিকট হইতে এই পরিবারের অনেকেই ১৮৯০- সালের মধ্যে ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন। রঘুনাথ সরকার মহাশয় বৃদ্ধ অবস্থায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাধামাধব সরকার মহাশয়কে তাঁহার স্থলে নিযুক্ত করিয়া দিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৫ সাল পর্যন্ত এই রাধামাধব বাবু প্রথম এই স্কুলে, পরে সেখানে হাইস্কুল হইলে সেখানে শিক্ষকতা করিয়া শেষে স্বদেশের স্কুলে শিক্ষক হইয়া এদেশ ত্যাগ করেন।

১৮৯০ সালের মধ্যে যাঁহারা ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন তাঁহাদের মধ্যে ২জন নর্মাল ত্রৈবার্ষিক, তাহার ২/৩ বছরের মধ্যে ২জন গুরুট্রেনিং পাশ করেন। ইহাদের মধ্যে ৬/৭জন শিক্ষকতার কাজ করেন এবং পরে অন্যান্য কাজে লিপ্ত হইয়া যান। গ্রামের অন্য পরিবারের ছাত্রদের মধ্যে কমলাকান্ত দাস, ভীষ্মদেব দাস, চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস, শশীভূষণ বিশ্বাস ইত্যাদি মহাশয়গণের নাম উল্লেখ যোগ্য।এই কমলাকান্তবাবু মোক্তারি পাশ করিয়াছিলেন এবং ভীষ্মবাবু এফ.এ পাশ করিয়া কমিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে এমএলসি (বাংলার আইনসভার সদস্য) শশীবাবু এন্ট্রান্স পাশ করিয়া সাব-রেজিস্ট্রার হইয়াছিলেন।

এই স্কুলে ঐ শতাব্দীর শেষভাগে মাননীয় গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয়ের বাটির নিকটস্থ তাঁহার এক ভিটিতে মাইনর স্কুলরূপে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে ৪/৫ বৎসর স্কুল চলিবার পরে পার্শ্ববর্তী ঘৃতকান্দি গ্রামের গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় গ্রামের পূর্বপ্রান্তে একটি হাইস্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার জন্য রীতিমত গৃহ নির্মাণাদি ও আসবাবাদি প্রস্তুত করেন। ১৯০৪ সালে ঐ দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। ওড়াকান্দির ঐ মাইনর স্কুলের ছাত্রগণ আসবাবাদি সহ ঐস্কুলে যোগ দেয়; কিন্তু তাহা ২/১ বৎসর চলার পরও যখন হাইস্কুল হইল না তখন বোঝা গেল গিরিশবাবু ওখানে স্কুল করিবেন না। ... ইহার পর দেখা গেল এই পরিবারের পূর্ব্ববাসভূমি ফুকুরা গ্রামে, যেখানে অনেক অন্যবর্ণের হিন্দুর বাস, সেখানে গিরিশ মেমোরিয়াল হাইস্কুল হইল। অন্যবর্ণ হিন্দু হইতে কোন দিক হইতেই কোনও সাহায্যের আশা অসম্ভব প্রমাণিত হইল। সে জন্য তাঁহারা (গ্রামের কর্তৃপক্ষগণ) ফরিদপুরে মিশনারী সাহেবের খবর লইতে আরম্ভ করিলেন।

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর সম্পাদিত 'গুরুচাঁদ ঠাকুর ও অন্ত্যজ বাংলার নব জাগরণ' বইয়ে সি.এস.মীড-এর লেখা ছাপান। সেখানে এই সাক্ষাতের বর্ণনা পাই---

ফরিদপুর মিশন ভবনে এই প্রশ্ন আমাকে করেছিল নমশূদ্রদের সেই প্রতিনিধিরা (শশীভূষণ ঠাকুর, ভীষ্মদেব দাস, বিধু চৌধুরী প্রমুখ), যারা এসেছিল দক্ষিণের ধান-জলাভূমি থেকে। 'আমরা এসেছি' তারা বলেছিল, 'এক শক্তিশালী অথচ হতভাগা শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে... আজ আমরা সর্বান্তকরণে চাই এক বৃহৎ ও উন্নত জীবনে উত্থিত হতে। আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন?

'হ্যাঁ' আমি বললাম, 'আমি আপনাদের সাহায্য করব। যীশুর অনুগামী হিসেবে মিশনারীরা সর্বত্রই সেইসব নিপীড়িতদের সাহায্য করতে প্রস্তুত, যারা কল্যাণের জন্য সচেষ্ট আছেন'।

'আমাদের মধ্যে কেউ একউ খ্রীষ্টান হবার কথাও ভাবছেন' বললেন একজন।

প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, হ্যাঁ, এটাই হলো উন্নয়নের সঠিক রাস্তা'।

১৯০৬ সালে এক দিন ভাদ্র মাসে অপরাহ্ন বেলায় গ্রামের পূর্বদিকে একটি গ্রীণবোট অর্থাৎ বজরা দেখা গেল। নৌকার আরোহী সেই মহাপ্রাণ পাদ্রি ডা সি.এস.মীড সপরিবারে ছিলেন।

সেইদিন গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয়, বিধুবাবু ও চন্দ্রকান্তবাবু তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া পরবর্তী দিনে তাঁহাকে এক সভায় সম্বর্ধনা করিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। পরদিন উক্ত গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয়ের বাটিতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইবার পর স্থির হইল তিনি এই গ্রামে হাইস্কুল স্থাপন করিবেন। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হাইস্কুল খোলা হইল। প্রথমাবস্থায় যখন ইউনিভার্সিটি স্কুল মঞ্জুর করিতে অনেক টাকা স্কুল ফান্ড দেখিতে চাহিল তখন ডা মীড নিরুপায় হইয়া কর্তৃপক্ষকে বলিলেন ৫০০০ টাকা না হইলে স্কুল বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয় হতাশ হইয়া বলিলেন--- এত টাকা কোথা হইতে আসিবে? ইহাতে বিধুবাবু বলিলেন, এই টাকার অভাবে স্কুল বন্ধ হইবে না। তাঁহার ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি বন্দক রাখিয়া তিনি টাকা সংগ্রহ করিবেন। এই কথাতে ঠাকুর মহাশয় উৎসাহিত হইলেন এবং বলিলেন, আচ্ছা দেখা যাক কি করিয়া টাকা যোগাড় হয়। তখন দেশ হইতে অনায়াসে এই টাকা সংগৃহীত হইল। বলাবাহুল্য, ঠাকুর মহাশয়ই সবার হইতে বেশি টাকা তাহাতে দান করিলেন।

চৌধুরীদের ইতিবৃত্তে এই সম্পর্কে লেখা- এই যে শিক্ষাপ্রবাহ এই পরিবারের মধ্যে তথা ওড়াকান্দি গ্রামে এবং উচ্চশিক্ষা সমস্ত জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করিল তাহার কৃতিত্ব প্রথমত এ পরিবারের (চৌধুরী) বাটির বিদ্যালয় স্থাপয়িতা

লেখকের পিতামহগণের। দ্বিতীয়ত, তাহা বিস্তারের জন্য ওড়াকান্দির পূজনীয় গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয়ের এবং সর্বোপরি সেই মহামতি ডাসিএস মীড-এরই একমাত্র প্রাপ্য। ... এই গ্রামের আদর্শে ও অনুকরণে অন্যান্য স্থলে পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে এই জাতীয়দের মধ্যে অনেক হাইস্কুল স্থাপিত হইয়াছিল।

একতা

'যার দল নাই তার বল নাই'। শক্তি মানে সঙ্ঘ শক্তি--- সেই বুদ্ধের শিক্ষা। ডা অনিল রঞ্জন বিশ্বাস (কপিল-২৪) লিখছেন, 'নমশূদ্রদের একাধিক বিভাগ ছিল। এ ব্যাপারে বঙ্গদেশকে তিনভাগে ভাগ করা যায় এবং প্রত্যেক ভাগে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস দেখা যায় তাই পূর্ব বাংলায় একাধিক শ্রেণি(১২টি) ছিল নমশূদ্রদের ১. হালোয়া, ২. ঘাসী, ৩. কান্দো বা বেহারা, ৪. করাল, কেরল, ৫. বাড়ি, ৬. বেরুয়া, ৭. বোদ, ৮. বককাল, ৯. সরালিয়া, ১০. আমরা কাদী, ১১. বাছঅড়, ১২. সন্দীপা এরা সব কাশ্যপ গোত্রীয়। মধ্য বাংলায় ছিল ৬টি শ্রেণি। ১. ধনী, ২. জালিয়া, ৩. জিরানী, ৪. কাড়াল, ৫. নুনিয়া ও ৬. শিয়ালী। পশ্চিমবঙ্গে ছিল ১১টি শ্রেণি--- হেলো, জেলো, কেশরকালো, কোটাল, মাজিলা, নলো, নুনিয়া, পানফুলে, সরো ও শিউলে এরা ভরদ্বাজ, ও লোমশ ও শান্ডিল্যগোত্রীয়।

বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সহভোজন ছিল না এবং অনেক ক্ষেত্রে বিবাহও চালু ছিল না। এ ব্যাপারে খুলনাই ব্যতিক্রম। এ ব্যাপারে ঐক্য ও জাত সচেতনতা গড়ে তোলবার জন্য প্রথম একটি মহাসম্মেলন হয় ১৮৮১ সালের ফাল্গুন মাসে খুলনা জেলার দত্তডাঙ্গার ঈশ্বর গায়েনের বাড়ির প্রাঙ্গনে। তার আগে যে বড় ঐতিহাসিক আন্দোলন হয়েছিল সেটা ১৮৭২ সালে।

১৮৭২ সালের বাখরগঞ্জে চারমাস ধরে নমশূদ্রদের ধর্মঘট

ডাঃ অনিল রঞ্জন বিশ্বাস / অন্ত্যজ বাংলার নবজাগরণে গুরুচাঁদের ভূমিকা/ কপিল

১৮৯১ সালে ফরিদপুর জেলার বৃত্তিধারী ১. ৫৩,৬২৮ জনের মধ্যে ৫ ৭ জন (০.০ ৪শতাংশ) চাষ করেন না অথচ জমির দখলকার, ২৯৩৫ জন (১ .৯ শতাংশ) জমির দখলকার ও চাষী ছিলেন। তাই নমশূদ্র সমাজের সবার আর্থিক অবস্থা সমান ছিল না। এঁদের মধ্যে যাঁরা কিছুটা শিক্ষিত হলেন এবং আর্থিক দিক থেকে বেশি স্বচ্ছল তাঁদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। কিন্তু

কিছু ঘটনায় তারা বুঝতে পারলেন যে তাঁদের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না তাদের চলতি নিম্ন সামাজিক মর্যাদা। এতেই জন্ম নিল ১৮৭২-৭৩ সালের নমশূদ্র আন্দোলন। জিলা পুলিশাধ্যক্ষ, ডব্লিউ.এল. ওয়েন ১৮৭৩ সালের ১৮ মার্চ ফরিদপুর জেলা শাসকের কাছে যে চিঠি লেখেন সেখানে এই আন্দোলনকে, 'হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক ধাপে নিজেদের উন্নীত করার এক প্রচেষ্টা' বলা হয়েছে। উপলক্ষ্য ছিল বাখরগঞ্জে আমগ্রামের এক অবস্থাপন্ন নমশূদ্র গ্রাম প্রধানের বাপের শ্রাদ্ধ। কায়স্থদের প্ররোচনায় উচ্চ শ্রেণির সদস্যেরা নমশূদ্রের বাড়ির নেমন্তন্ন গ্রহণ করেননি। অজুহাত, নমশূদ্র মহিলারা বাজার যায় এবং জেলখানায় ঝাড়ুদারের কাজ করে, নোংরা ও ময়লা পরিষ্কার করে। তক্ষুনি সমস্ত নমশূদ্র প্রধানদের ডাকা হয় এবং প্রস্তাব পাশ হয় যে--- ১) নমশূদ্র মহিলারা হাট-বাজার যাবেন না, ২) অন্য জাতের সঙ্গে কোনওপ্রকার কাজ করা হবে না এবং ৩) ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোনও হিন্দু জাতের তৈরি খাবার খাওয়া যাবে না । সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চল পরিদর্শনকারী সরকারী কর্মচারীদের জানিয়ে দেওয়া হলো যে নমশূদ্র অপরাধী ও অন্য জাতের অপরাধীদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে হবে। উদ্যোক্তারা অবশ্য অবহিত ছিলেন না যে, না-কাজ কর্মসূচীতে গরীবেরা ব্যাহত হবেন। তাই রক্ষাকবচ হিসেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে তাদের আত্মীয়স্বজনেরা তাদের ভরণপোষণ করবেন আর আত্মীয়স্বজন না থাকলে গ্রাম-সমাজ ভার নেবে। এতদ্‌সত্ত্বেও যাঁরা এই আন্দোলনে সামিল হতে অস্বীকৃত হবেন তাঁদের হবে সামাজিক নির্বাসন। বড়ো বড়ো ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হলো, সরকারই আদেশ দিয়েছেন ঐ সব প্রতিপালনের জন্য। ফলে আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল বহুলাংশে ... এই ধর্মঘট এতদূর সফল হয়েছিল যে এর প্রারম্ভের ৪ মাস পরে ফরিদপুরের জেলা শাসক ঐ অঞ্চলে সফরে দেখতে পান যে মাঠগুলি অনাবাদি পড়ে আছে, ঘরগুলি ছাওয়া হয়নি, আর কোনও নমশূদ্রকে দেখা যায় না হিন্দু বা মুসলমানের কাজে। ---তবে গরীব নমশূদ্রদের এভাবে সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে তাঁরা ফিরে আসেন তাঁদের পুরনো কাজে, তবে পূর্বের চেয়ে আরও খারাপ শর্তে। উচ্চজাতের লোকেরা তখনও এঁদের হাত থেকে জল ও খাবার গ্রহণ করেননি আর সরকারের মনোভাব একাজে হস্তক্ষেপ না করা। তবে জেলখানায় ময়লা সাফাইয়ের কাজে জোরজুলুম করা যাবে না এটা ঠিক হয়।

শুরু হলো সমাজকে পুনর্নির্মাণের কাজ। এক এক করে সেগুলো দেখব।

নমশূদ্র কল্যাণ সমিতি— নমশূদ্র জাতিকে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, ব্যবসাবাণিজ্যে এবং কৃষিতে উন্নয়নের জন্য এই সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির কাজ ছিল বহুমুখী। শিক্ষাবিস্তার, রাস্তাঘাট নির্মাণ, মজা পুকুর খনন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, ... উপায়ে জীবনধারণ করা, মানুষের দুঃখের দিনে সাহায্য করা। বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ানো। অত্যাচারের প্রতিবাদ করা, জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করা। আদালতে না গিয়ে গ্রাম্য-সালিশী সভার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করা। গুরুচাঁদ সভায় উপস্থিত থাকলে তিনিই সভাপতিত্ব করতেন। সভায় সমিতির কর্মপদ্ধতির পর্যালোচনা করা হোত। গ্রামে-গ্রামে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা হোত, সমিতির আয়-ব্যায়ের হিসেব পেশের ব্যবস্থা ছিল। '**নমশূদ্র কল্যাণ সমিতি**' শিরোনাম হলেও এই সমিতি শুধু নমশূদ্র সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কাজ করেনি। গরীব ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান এবং অন্যান্য অনগ্রসর জাতিসমূহের কল্যাণেও কাজ করেছে। --- একবার মাছকান্দি বালাবাড়ি শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে সভা বসেছে। সভাপতি গুরুচাঁদ ভাষণ রাখছেন, ভাইসব, মনে রাখবে, শুধু নমশূদ্র সম্প্রদায়ই দুঃখকষ্টে দিন কাটায় না। জমিদাররা শুধু নমশূদ্রদেরই শোষণ করে না। সমাজে এমন অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ আছে, অনেক কাপালি, মাহিষ্য, পাল, তেলি, মালো, মুসলমান আছে যারা দিনে দুইবেলা দুটো পেট ভরে ভাত খেতে পায় না। পরনে বস্ত্র নাই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নাই। বাড়িতে পায়খানা পর্যন্ত নাই। ছেলেমেয়ে মানুষ করার টাকাপয়সা নাই। এরাও পতিত, এরাও দলিত, এরাও আমাদের সাথী--- আমাদের মুক্তি আন্দোলনের শরিক। এদের ভাই বলে জানবে। সব ব্রাহ্মণ-কায়স্থই আমাদের দুর্দশার জন্য দায়ী নয়। যেসব জমিদার, জোতদারেরা, শিক্ষিত বাবুরা আমাদের শোষণ করে, আমাদের মানুষ বলে মনে করে না, অস্পৃশ্য বলে দূরে ঠেলে দেয়, তারাই আমাদের পরম শত্রু--- এরা নমশূদ্র হলেও আমাদের স্বজাতি নয়--- এদের বিরুদ্ধেই আমাদের আন্দোলন।

লক্ষ্মীর গোলা--- মরশুমের সময় ধান সংগ্রহ করে গোলায় রাখা হোত। দাম বাড়লে বিক্রি করে বিভিন্ন উপকরণ কিনে সামাজিক কাজে লাগানো হোত।

হাজতের টাকা--- গুরুচাঁদ ছিলেন বিজ্ঞ প্রশাসক, দক্ষ হিসেবরক্ষক এবং নিপুণ পরিচালক। একবার সিংগার পাড়ায় গুরুচাঁদ ভাষণ দিচ্ছেন। হঠাৎ নবীন বিশ্বাস নামে একটা ছেলে ভক্তদের কাছ থেকে হাজত নেন তার হিসেব চান। অনেকে ক্ষেপে যায়। গুরুচাঁদ তাদের নিরস্ত করে বলেন, এই হাজতের

টাকা তো আমার নয়--- এ যে রোগভোগের জরিমানা। এ টাকা হজম করা আমার মত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার নাতি শ্রীপতিকেও এর একটা কাণাকড়ি ধরতে দেই না। এই ধন ভক্তবৃন্দের সম্পদ। ওরাই এর মালিক। এ অর্থ ভক্তদের কাজেই ব্যয় হয়--- এ টাকা ঠাকুর বংশের জন্য নয়।

(বাদল কৃষ্ণ সরকার / সমাজকল্যাণে গুরুচাঁদ/ কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর সম্পাদিত গুরুচাঁদ ঠাকুর ও অন্ত্যজ বাঙ্গলার নবজাগরণ, পৃ: ৮৯, ১০২ বছর বয়সী মনোহর অধিকারীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচনা।)

সভাসমিতি

লোকের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করতে হলে তাদের বুঝতে হবে, তাই প্রয়োজন জনসভার। সেই সময় শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়স্বজনেরা আসতেন। বর্ধিষ্ণু পরিবারের তো কথাই নেই, ৪-৫ হাজার লোকের জমায়েত হোত এইসব সভায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটো সভার বর্ণনা করছি।

১৮৮১ সালের ফাল্গুন মাসে গুরুচাঁদ ঠাকুরের উদ্যোগে খুলনা জেলার মোল্লাহাট থানার দত্তডাঙা গ্রামে ঈশ্বর গায়েন মহাশয়ের বাড়ির উঠোনে সর্বপ্রথম নমশূদ্রদের এক মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, ময়মন সিংহ প্রভৃতি জেলা থেকে ৫ হাজার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের বয়স তখন মাত্র ৩৫ বছর। তবুও তিনি এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা--- সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, শোষণ-নিপীড়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন তিনি। এবং এর থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে দিকনির্দেশ করেন।

১৯২৩ নিখিলবঙ্গ নমশূদ্র সম্মেলনঃ সভাপতি- গুরুচরণ বিশ্বাস, কর্মাধ্যক্ষ- সীতানাথ ও মুকুন্দবিহারী মল্লিক। উপস্থিত সদস্য বাগেরহাট থেকে রাইচরণ ও রাজেন্দ্র মালাকার, বরিশাল থেকে আনন্দ সাধক, ফিরোজপুর থেকে সনাতন এরকম বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিষ্ঠিত নমশূদ্র নেতা প্রতিনিধিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণ পাঠ করেন নীরদবিহারী মল্লিক। সেখানে গুরুচরণ বলেন (মহানন্দের ভাষায়)

ভোগ হলে জাগে ত্যাগ-- কিছু নাই কিসে ত্যাগ/'ভোগ চাই' এইমাত্র বলি/বিদ্যা চাই, ধন চাই, বসন ভূষণ চাই/হতে চাই জজ মেজিস্ট্রেট।

সংবাদপত্র:

মতপ্রকাশের এবং প্রচারের জন্য জনসভা যথেষ্ট নয়। চাই পত্রিকা। যা একজন থেকে আর একজন পড়তে পারে। যা সংরক্ষণ করা যেতে পারে বা ভবিষ্যতে দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু হলো ওড়াকান্দি গ্রামে।

১৮৯০/৯৫ সাল হইতেই সমাজ সংস্কার আন্দোলন এই গ্রামে আরম্ভ হয়। সমাজে তখন অশিক্ষার জন্য অনেক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। তাহা দূরীকরণের জন্য একটি জাতীয় সমিতি গঠিত হয়। তাহাতে মাননীয় গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি ছিলেন এবং তাহার ১৫ জন সভ্যের মধ্যে আলোচ্য পরিবারের ৬জন সভ্য হইয়াছিলেন-- তাঁহারা সভা সমিতি করিয়া অনেক কুসংস্কার বিদুরিত করিয়াছিলেন। তাহারই অঙ্গ স্বরূপ পরে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পরিবার হইতে আদিত্য চৌধুরী মহাশয়ের ও পরে ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র সুধন্য ঠাকুর মহাশয়ের সম্পাদনায় ' নমশূদ্র-সুহৃদ' নামক এক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া সমাজের প্রভুত মঙ্গল সাধন করা হয়।

চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ/ চৌধুরী পরিবারের ইতিবৃত্ত ও বংশপঞ্জী/চতুর্থ সংস্করণ-৫৪

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নমশূদ্রদের অংশগ্রহণ না করা:

মোটামুটি বাংলা বিভাজনের জন্য দায়ী ঘটনাগুলো এক নজরে দেখে নেই। তখন বাংলা বলতে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, অসম, ঝাড়খণ্ড ও বিহার নিয়েই গঠিত ছিল ১৯০৫ এর বাংলা। প্রশাসনের কাজের সুবিধার জন্য ১৮৫৪ সালে বাংলায় লে: গভর্নরের পদ সৃষ্টি হয়। ১৮৭৪ সালে চিফ কমিশনারের অধীনে আসাম একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়। ১৮৯২ লুসাই উপজাতিদের বিদ্রোহ। ১৮৯৬ সালে চাঁটগার কমিশনার ওল্ডহাম আসাম, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের অংশ নিয়ে পূর্ববাংলা নামে নতুন একটি প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেছিলেন। ১৯০৫ সালের ৯ই জুন ব্রিটিশ সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, পার্বত্য ত্রিপুরা ও আসাম নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের অনুমতি দেয়। তখন এই প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল তিন কোটি ১০ লক্ষ। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়-- ১ কোটি ৮০ লক্ষ। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। (মুনতাসির মামুন/১৯০৫ সালের

বঙ্গভঙ্গ ও তার পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া/মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯)

'আগস্ট মাস থেকে কংগ্রেস বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার ডাক দেয় এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কথা ঘোষণা করে।

নমশূদ্র এবং নিম্নবর্ণের মানুষের সাথে উচ্চ বর্ণহিন্দুদের সামাজিক দ্বন্দ্ব তখন তুঙ্গে। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা ও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের তার বিরোধিতা এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের ফলে এবার গরীব নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে উচ্চবর্ণীয়দের অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তারা পরস্পর দুই বিপরীত মেরুতে চলে যান।

পূর্ব বাঙলার অধিকাংশ প্রজা নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও মুসলমান এবং জমিদার-জোতদার- ভূস্বামীরা উচ্চবর্ণের মানুষ-- তাদের বাসস্থান, সংস্কৃতি ও শক্তি কলকাতা কেন্দ্রিক। তাই বঙ্গভঙ্গে তারা সমূহ বিপদ দেখতে পান। অন্যদিকে গরীব কৃষকদের পক্ষে কম দামে বিলাতী দ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। তাই বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন তাদের ক্ষুব্ধ করে। (সুকৃতি বিশ্বাস/দলিত মুক্তি আন্দোলন/চতুর্থ দুনিয়া/১৯৯৭/পৃ: ৬২-৬৩)

চিত্তরঞ্জন দাস নিম্নবর্গীয়দের সাহায্য জন্যে তাদের নেতা গুরুচরণের কাছে চিঠি লেখেন। গুরুচরণ তার যে উত্তর দিয়েছিলেন মহানন্দ হালদারের ভাষায় (পৃ: ৪১৪) --- এই পথে স্বাধীনতা আসে না কখনো।/সমাজের অঙ্গে আছে যত দুর্বলতা।/ আগে তাহা দূর করা আবশ্যক কথা।/ এই যে দলিত জাতি যত বঙ্গদেশে।/ইহাদের দুঃখ কেহ দেখে নাকি এসে?/কিবা খায়? কোথা পায়? কোন কার্য করে?/সন্ধান রাখে না কেহ কোনওদিন তরে।।/ দিনে দিনে এরা সবে হয়েছে হতাশ।/আর এক মহাদুঃখ ইহাদের মনে।/উচ্চবর্ণ ইহাদিগে 'অস্পৃশ্য' বাখানে।/--- গুরুচাঁদ ঠাকুর পুত্র শশীভূষণের মাধ্যমে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার সাথে যোগাযোগ করে নমশূদ্র ও মুসলমানরা একযোগে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেন।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে ২ অক্টোবর ১৯০৬ সালে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাস হয়:

১. ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও চক্রান্তের ফলে বিশাল নমশূদ্র সম্প্রদায় পিছিয়ে পড়েছে। কাজেই এখন থেকে তারা মুসলমানদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন।

২. সেক্রেটারি অব স্টেটকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়--- যেহেতু তিনি ঘোষণা করেছেন যে, বঙ্গভঙ্গ মীমাংসিত ঘটনা এবং পরিবর্তনযোগ্য নয়।

৩. ছোটলাট ল্যান্স লট হেয়ারের কাছে নমশূদ্রদের জন্য সেই সব সুবিধা ও অধিকার দাবি করা হয়--- যা ইতিমধ্যে মুসলমানদের দেওয়া হয়েছে--- কেননা, পূর্ববঙ্গে এই দুটি সম্প্রদায়ই প্রধান (সুকৃতি - ঐ)।

এই আন্দোলনের ফলে নমশূদ্রদের যা লাভ হয়েছিল সে ব্যাপারে সুকৃতিবাবু তার বঙ্গ প্রদেশের ভদ্রলোক শ্রেণি ও সাম্প্রদায়িকতা বইতে লিখছেন যে, 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে' ১৯০৭ সালে অস্পৃশ্যদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ নিষিদ্ধ করার আদেশ প্রত্যাহার করে নেয় এবং অস্পৃশ্যরা ঐ বছর থেকেই সরকারি চাকরিতে যোগদানের সুযোগ পান। ঐ আদেশ প্রত্যাহারের ফলে ঐ সালেই শশীভূষণ ঠাকুর সাবরেজিস্ট্রার, মোহনলাল বিশ্বাস দারোগা, রাধানাথ মণ্ডল ও সিদ্ধেশ্বর হালদার কানুনগো, ডা: তারিণী বল সরকারি ডাক্তার ও কুমুদবিহারী মল্লিক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর চাকরি পান। বাংলায় এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও মুম্বই প্রদেশে ১৯২৮ পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা চালু ছিল (পৃ: ৩৯)।

যা হোক উচ্চবর্ণীয়দের চাপে সরকার শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লি দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ও কলকাতা থেকে দিল্লি রাজধানী স্থানান্তরণের কথা ঘোষণা করেন।

চণ্ডাল নাম মোচন:

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত নমশূদ্রদের চণ্ডাল বলা হতো। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে চণ্ডালরা গ্রামের বাইরে বাস করে, মৃতদেহ পোড়ায়, মরার গায়ের থেকে কাপড় নিয়ে ব্যবহার করে, তাদেরকে 'ডোম' ও বলে। (মহেন্দ্র-২৩৮)। এই চণ্ডাল নাম থাকার জন্য তাদের সরকারি ক্ষমতা যেমন প্রশাসনে অংশ নেওয়া ও চাকুরি ক্ষেত্রে অসুবিধা হতো। এবার গুরুচাঁদের কাজ হলো সরকারি খাতা থেকে চণ্ডাল নাম সরানো, মীড সাহেবের সাথে আলোচনা করে জানতে পারলেন যে আদমসুমারী রিপোর্টের নকল আনতে ৩৫ টাকা লাগবে। ৩৫ টাকা কোথায় পাওয়া যায়? এই সময় তালতলা নিবাসী প্রহ্লাদ যাদব তার মায়ের শ্রাদ্ধে গুরুচরণকে নিমন্ত্রণ করতে আসেন। গুরুচাঁদ তার কাছে ৩৫ টাকা চায়। যাদব দেয় পাঁচ টাকা। বলে সমাজের কাজ, সে কেন অত টাকা দেবে? গুরুচাঁদ ক্ষেপে যায়। বলে সমাজের মহানন্দের ভাষায়--

বাক্য দিয়ে বাক্য ঠেলা ধ্বংস হবে তালতলা/ফেলা, টাকা এনে তুই ফেলা।/টাকা আন টাকা চাই তা না হলে রক্ষা নাই/মোর বাক্য করিস না হেলা।/তালতলা নদীর জল ফুলে ওঠে, তখন লোকের চাপে যাদব ওই টাকা এনে দেয়।

গুরুচাঁদ মীড সাহেবের সাথে আলোচনা করে ৩৫টাকা দিয়ে আদমসুমারী রিপোর্ট আনিয়ে দেখলেন সেখানে নমশূদ্র বলে কোন জাতের উল্লেখ নাই। তার বদলে 'চণ্ডাল' লেখা আছে যারা কোন নিয়ম সংস্কার মানে না। মীডের কথায় গুরুচাঁদ বিধবা বিবাহের আয়োজন করেন। সেন্সাস কমিশনার ছিলেন মি. গেটে। সমস্ত নমশূদ্ররা তার কাছে আবেদন করে। মীড সাহেব লিখে দিলেন, আমি সম্মত। গেটে জাতিমালা গ্রন্থের প্রণেতা ন্যায়রত্নের কাছে জানতে চায়। উত্তরে ন্যায়রত্ন লিখে পাঠায়, বাংলায় নমশূদ্র বলে কোনও জাতি নাই। 'চণ্ডাল' সকলে তারা প্রমাণেতে পাই। এই চিঠি পেয়ে গেটে আবার মীডের কাছে চিঠি লিখল। মীড় সমস্ত মিশনারীদের 'নমশূদ্ররা' অসভ্য নয় একথা লিখতে বলল। মীডের যুক্তি মেনে গেটে ১৯১১ সাল থেকে চণ্ডাল শব্দের বদলে নমশূদ্র লেখা শুরু করেন।

কাজিয়া নমো-মুসলমান দাঙ্গা

সেই সময় শ্রমজীবীদের অধিকাংশ ছিলেন নমশূদ্র ও মুসলমান। আর উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা এদের লড়িয়ে মজা দেখত। কারণ এরা এক হলেই তাদের বিপদ। তাছাড়া নমশূদ্র লাঠিয়ালদের অনেকেই ছিলেন বেপরোয়া ধরনের। মুসলমানদের মধ্যেও এরকম বেপরোয়া চরিত্রের লাঠিয়াল কম ছিল না। শক্তি ও দাপট মাঝে মাঝে প্রদর্শন করতে না পারলে তাদের ভালো লাগত না। নমশূদ্র ও মুসলমান লাঠিয়ালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য রেষারেষিও কম ছিল না ফলে অকারণে বা তুচ্ছ কারণেও তারা মাঝে মাঝে কাজিয়াতে জড়িয়ে পড়ত (সুকৃতি/দলিত মুক্তি আন্দোলন/পৃ-৬৮)।

এরকম একটি দাঙ্গা হয় বাংলা ১৩৩০ (ইংরিজি ১৯২৩) সালে পদ্মবিলা নামে এক জায়গায়। দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে প্রমথ বাবু তাঁর আত্মকথায় (পৃ-১৮৫) লিখছেন--- যে কয়েকজন নমশূদ্র কৃষক পার্শ্ববর্তী মুসলমানদিগের জমিতে মলত্যাগ করিলে স্থানীয় নমশূদ্র এবং মুসলমানদিগের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

এই খবর ঠাকুরবাড়িতে আসলে রাতে কারো ঘুম হয় না। সকালে দাঙ্গায় আশু কর্তব্য নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। পদ্মবিলার শূন্য ময়দানে এক মাইল জায়গা জুড়ে নমশূদ্র ও মুসলমানরা সারবেঁধে দাঙ্গার জন্য ঢাল শড়কি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই দলের মাঝখানে খালের মত একটা শূন্য ডোবা ছিল। নমশূদ্ররা একটু এগিয়ে আবার ভয়ে পিছিয়ে আসার ভাণ করে। মুসলমানরা ভাবল নমোরা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে। তারা, 'আল্লাহু আকবর' বলে নমোদের ওপর ঝাঁপিয়ে খালের মধ্যে নামল। নমোরা খালে নেমে মুসলমানদের মারতে লাগল। প্রচুর লোক মারা পড়ল। লাশ সরিয়ে ফেলা হলো। কাজিয়ার পর বৃষ্টি শুরু হলো। তাতে রক্তের দাগ মুছে গেল।

দাঙ্গার খবর ফরিদপুর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সেইদিনই তারযোগে পৌঁছে গেল। তিনি পুলিশ সুপারকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে রওনা দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট হিন্দু-মুসলমানদের নেতাদের ডেকে একটা শান্তি সভার আয়োজন করলেন। তখন বাবু ভীষ্মদেব দাস আর উত্তর ফরিদপুরের মুসলমান নেতা রহমজুমান চৌধুরী তদানীন্তন বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় এলাকা শান্ত হয়। নরহত্যা কিম্বা খুনের জন্য কোনও অভিযোগ টেঁকে নাই কারণ কোনও সাক্ষী জোগাড় করা সম্ভব হয় নাই।

এই পর্যন্ত আমরা দেখলাম হরিচাঁদ আর গুরুচাঁদ কিভাবে নমশূদ্র সমাজকে আত্মসম্মানের পথে সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কী কী করলেন। তার মূল্যায়ন করার আগে একবার দেখে নেব সমসাময়িক কালে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দলিত মুক্তি আন্দোলন।

যেহেতু হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ জাতিপ্রথার শিকার যারা তাদের উত্থানের জন্য কাজ করেছেন, তাই ভারতে অন্যান্য জায়গায় এই ধরনের কাজের কথা জানলে আমাদের সুবিধা হবে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের কাজের মূল্যায়ন করতে। তাই ভারতে অন্যান্য প্রদেশে দলিত উত্থানের ইতিহাসটা একটু দেখি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাইশোর ও কোলাপুরের রাজারা অব্রাহ্মণদের জন্য চাকুরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

১৮৭৩ সালে মহারাষ্ট্রের জ্যোতিরাও ফুলে (জন্ম-১৮২৭ সালের ১১ই এপ্রিল) সত্যসাধক সমাজ গঠন করেন। তিনি বলেন আধিপত্য ও ক্ষমতার দ্বারা ব্রাহ্মণরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা দখল করে নেওয়াটাই শূদ্র ও অতিশূদ্রের কষ্টের

কারণ। বিদেশী ব্রাহ্মণরা ভূমিপুত্রদের পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করেছে। আজ তাই অব্রাহ্মণ কৃষক ও দলিতদের মিলিত হয়ে আন্দোলন করা দরকার।

১৮৯২ স ালে মাহার এবং মাং-রা যোদ্ধাজাতি নয় বলে সামরিক বিভাগে চাকরি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯১৯ সালের পর মহারাষ্ট্র অব্রাহ্মণ রাজানুগত সংঘ গঠিত হয় অন্যদিকে সাধক সমাজ 'সাট্টি-ভাট্টি' (শেঠ ও ব্রাহ্মণ) বিরোধী সংঘ গড়ে তোলে। ১৯৩০ সাল থেকে কংগ্রেসের মধ্যে অব্রাহ্মণদের আশা আঙ্খা কাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। কেশভিরাও জেধে ও ব্রাহ্মণ এন.ভি.গেডগিল এর উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সির অব্রাহ্মণ আন্দোলন কংগ্ে এসের সাথে মিশে যায়।

মাদ্রাজে ব্রাহ্মণরা সেখানকার জনসংখ্যার ৩ শতাংশ হয়ে ৪২ শতাংশ সরকারি চাকরি দখল করে। তারা সংস্কৃত ঐতিহ্যের বড়াই করত। আঞ্চলিক ভাষা ও তামিল ভাষাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখত। অভিজাত ভেল্লালারা তাদের দ্রাবিড় পরিচয় তুলে ধরে। খ্রীষ্টান মিশনারী রেভারেন্ড রবার্ট কাল্ডোয়াল ও জি. ই. পোপ দ্রাবিড় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন ও বলা শুরু করেন যে তামিল সংস্কৃত, যা কয়েকজন ব্রাহ্মণ দক্ষিণে নিয়ে এসেছে, থেকে উদ্ভুত নয়।

১৯১৬ সালে জাস্টিস পার্টি তৈরি হয়। তারা মর্লে-মিন্টো রিফর্ম যেমন মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী দ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন তেমনি অব্রাহ্মণদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী দ্বারা নির্বাচনের দাবি করে। ১৯২০ সালের নির্বাচনে জাস্টিস পার্টি মাদ্রাজ বিধানসভায় ৯৮টি আসনের মধ্যে ৬৩টি আসনে জয়লাভ করে।

১৯২০ সালে মন্ত্রীসভা গঠনের পরেই এর পতনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিল তামিলনাড়ুর ভেল্লাল, তেলেগুর রেড্ডি ও কাম্মান, মালাবার এর নায়ার ইত্যাদি সম্প্রদায়। যারা জিতেছিল তাঁরা ক্ষমতা পেয়ে অস্পৃশ্যদের সমস্যার কথা ভুলে যায় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করে। বিরক্ত হয়ে বাকীরা এম.সি. রাজার নেতৃত্বে জাস্টিস পার্টি ত্যাগ করে। ফলে ১৯২৬ সালে জাস্টিস পার্টি স্বরাজ পার্টির কাছে হেরে যায়। অনেক অব্রাহ্মণরা জাস্টিস পার্টি ছেড়ে কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দেয়। ১৯৪৬ সালে জাস্টিস পার্টি ভোটেই দাড়াল না।

আম্বেদকর-- দলিত মুক্তি আন্দোলনকে যদি কেউ সঠিকভাবে চালিত করেন তবে তিনি ভীমরাও আম্বেদকর। মহারাষ্ট্রের অস্পৃশ্য মাহার পরিবারে

জন্ম। অনেক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে বরোদার রাজার অধীনে দশ বছর চাকরি করতে হবে এই শর্তে আমেরিকায় পড়তে যান (১৯১৩ থেকে ১৯১৬)। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে কাজ করতে পারলেন না। অস্পৃশ্য যে, থাকার জায়গা কেউ দিল না। সিডেনহাম কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলেন। মনোনীত হলেন মুম্বাই আইনসভায়। শুরু হল অস্পৃশ্যদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম। মাহাদ মিউনিসিপ্যালিটির চৌদা সরোবরের জল অস্পৃশ্যরা ব্যবহার করতে পারত না। সেই জল ব্যবহারের জন্য কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে ১৯শে মার্চ, ১৯২৭ সেই সরোবরের জল পান করলেন।

'মূক নায়ক' 'বহিষ্কৃত ভারত' পত্রিকা প্রকাশ করে অস্পৃশ্যদের জাগরণের ব্যবস্থা করলেন। অস্পৃশ্যদের সংগঠিত করা শুরু করলেন। শাসন সংস্কারের জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন ভারতে এল কিন্তু কোন স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের নেতাদের ডাকা হলো না। ফলে তারা কমিশন বয়কট করলেন। এবং ভারতের সব দল মিলে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে এক সভা করে এক সংবিধান তৈরি করলেন। অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধি হিসেবে আম্বেদকরকে সেখানে ডাকা হলো না। আম্বেদকর কমিশনের সাথে দেখা করে অস্পৃশ্যদের পক্ষ থেকে অনেক দাবি পেশ করলেন। সে সব নিয়ে আলোচনার জন্য ইংলন্ডে গোলটেবিল বৈঠকে অস্পৃশ্যদের নিজেদের নেতা নির্বাচিত করার অধিকার দেওয়া হলো। কিন্তু এতে গান্ধী বললেন, এতে হিন্দু ধর্ম ভেঙে যাবে। এর বিরুদ্ধে গান্ধী অনশনে বসলেন। ভারতের সব দল এমনকী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হিন্দু একতার পক্ষে গান্ধীকে সমর্থন করলেন। অগত্যা আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষণ চাইলেন। অস্পৃশ্যদের নতুন পরিচয় হলো শিডিউল্ড কাস্ট (তালিকাভুক্ত জাতি)। ৭১টি আসনের জায়গায় পেলেন ১৪৮টি আসন।

১৯৩৭ সালে বোম্বাইয়ের আইন সভার নির্বাচনে ব্রাহ্মণ ভাপোতকরের 'ফ্রীডম পার্টি'-র সাথে জোট বেঁধে তার দল 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি' ১৭টি আসনের মধ্যে ১৫টি আসনে জয়লাভ করল। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস ধর্মঘট-এর বিরুদ্ধে এক বিল আনে। আম্বেদকর কম্যুনিষ্ট নেতাদের সাথে মিলে সেই বিলের বিরোধিতা করেন, তিনি বলেন, 'স্বাধীনতা যদি কংগ্রেসের জন্মসিদ্ধ অধিকার হয় তবে ধর্মঘট করাও শ্রমিকদের জন্মসিদ্ধ অধিকার'। এর পর শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আম্বেদকর সর্বভারতীয় তপশিল নেতাদের নিয়ে ফেডারেশন তৈরি করলেন।

১৯৪২ সালে শ্রমমন্ত্রী হিসেবে কাজ করলেন। শ্রমিক কল্যাণকারী প্রচুর নিয়ম পাশ করলেন। যুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ফেডারেশন বর্ণবাদীদের অর্থ ও পেশী শক্তির কাছে হার মানে। ক্রিপস যখন ভারতে আসেন তখন আম্বেদকর তার সাথে তফশিলিদের অভাব অভিযোগ নিয়ে দেখা করতে গেলে তিনি আম্বেদকরকে তফশিলদের নেতা বলে মানতে চাইলেন না কারণ তিনি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। এদিকে মাউন্টব্যাটেনকে পাঠানো হলো। গণপরিষদ তৈরি করে সেখানে নতুন সংবিধান তৈরি করার ব্যবস্থা করা হলো। আম্বেদকরকে সেখানে না পাঠালে তফশিলিদের স্বার্থের কথা কে বলবেন? বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পাঁচজন সদস্যকে রাজি করলেন আম্বেদকরকে নির্বাচিত করার জন্য। আম্বেদকর একটা খসড়া সংবিধান বানিয়ে জমা করলেন, যা পড়ে সামন্তবাদী ও পুঁজিপতিদের দল কংগ্রেসের মাথায় হাত। এ দেখি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো তুলে দিয়েছে। এ লোক বাইরে থাকে কমিউনিস্টদের সাথে মিলে বিরাট এক গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন।

এদিকে বাংলা ভাগ হলো। আম্বেদকরকে যারা নির্বাচিত করেছিলেন তাদের নির্বাচনী এলাকা পূর্ব পাকিস্তানে পড়ায় গণ পরিষদে আম্বেদকরের সদস্যপদ খারিজ হয়ে গেল। কিন্তু এখন যে কংগ্রেসের আম্বেদকরকে খুব প্রয়োজন। তাই মহারাষ্ট্র থেকে জিতিয়ে তাকে সংবিধান রচনা কমিটি'র চেয়ারম্যান বানিয়ে দেওয়া হলো। তিনি সংবিধানের যে খসড়া বানালেন তা গণপরিষদে অনেকটাই ছাঁটাই করা হলো। তিনি দেশের মানুষকে যে মূল অধিকার দিতে চেয়েছিলেন তা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো নির্দেশিকায়। বিরক্ত হলেন আম্বেদকর। কিন্তু বাইরে থাকলে বিপদ তাই আইনমন্ত্রী করে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে মন্ত্রীসভায় রাখা হলো। শরীর ভেঙে এসেছে। ১৯৩৫-এ ঘোষণা করেছিলেন আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি, কিন্তু হিন্দু হয়ে মরবো না। হিন্দুদের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়ল না। তাই ১৯৫৬ সালে তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। রাজনীতির জগতে শুধু তফশিল নিয়ে আন্দোলন করলে হবে না তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'রিপাব্লিক পার্টি'। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ধকল শরীর আর সইতে পারছিল না। ১৯৫৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর কাজ করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আন্দোলনের মূল্যায়ন:

অগুরুচাঁদের নেতৃত্বে নমশূদ্রদের একতাবদ্ধ হওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে তাদের যে উন্নতি হয়েছিল তা স্বীকার করেও বলতে হয় কিছু বিষয়ে সংশয় ও দ্বিধা রয়ে গেছে তা নিচে আলোচনা করলাম।

চন্ডাল নাম মোচন:

'ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থে শ্রী উপেন্দ্র বিশ্বাস চণ্ডাল শব্দের উৎপত্তি খোঁজ করতে গিয়ে কর্ণধার শব্দ থেকে কান্ডার-কাঁড়াল-চান্ডাল-(চন্ডাল-চাঁড়াল) এই ভাবে দেখিয়েছেন (পৃ-৩৪১)। যে চন্ডাল প্রথমে সম্ভ্রমবাচক শব্দ ছিল। আমরা দেখি রাম গুহক চন্ডালের সাথে আলিঙ্গন করছেন। শান্তনু কান্ডারী কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছেন। লেখক বলেছন, ভারতবর্ষে অসুর পক্ষের চূড়ান্ত পরাজয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে (১৪০০ খৃঃ পূঃ) ঘটিয়াছিল এবং তাহার পর অসুরপক্ষীয় ধর্মনেতা ও রাষ্ট্রনেতাগণের নিধন বা দেশত্যাগের ফলে চন্ডালগণ বহুলাংশে ব্রাহ্মণ্যধর্মী সমাজপতিগণের অনুগ্রহের বা কৃপার পাত্র হইয়া পড়িলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মীগণ লিখিত গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে 'চন্ডালগণ' বহুকাল পর্যন্ত একটি 'ব্রাহ্মণ-বিরোধী' ও 'বেয়াড়া' সম্প্রদায় হিসেবে চলিয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মী সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায় যেরূপ ভাবে ব্রাহ্মণগণের নির্দেশ বা উপদেশ মানিয়া নির্বিবাদে চলিত চন্ডালগণ কখনো তাহা করে নাই।

চন্ডাল গালিবাচক শব্দে পরিণত হলো কেন? ব্রাহ্মণরা তাদের বিরুদ্ধে যে বা যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তাদের প্রতি অপমানসূচক শব্দ ব্যবহার বা গালাগালি দেওয়া শুরু করে। যে অসুররা একদিন সম্মানিত ছিল তারা পরবর্তীকালে নিন্দিত হলো। ডাকিনী- যুগিনী বৌদ্ধধর্মে সম্মানীয় পূজারী ছিল, তাদের কালীর পাশে লাগিয়ে দিল বীভৎস রূপ দিয়ে। মহত্তর শব্দকে মেথর বানিয়ে দিল। ধর্ম ঠাকুরের পূজারি ডোম। এরা সবাই ব্রাহ্মণের কাছে নিন্দাবাচক শব্দ। শুধু তাই নয়, নিজেদের ব্রাহ্মণ প্রমাণ করার জন্য ব্রাহ্মণরা যে মিথ্যাচারের পথ গ্রহণ করেছিল, নমশূদ্ররাও সেই পথ অবলম্বন করল। 'শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্র' নামে একটা তন্ত্র যা জীবন জোদ্দারের টাকা দিয়ে এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে লেখান হলো, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আবার কশ্যপ মুনির বংশধর বলে দাবি করা গোত্র এক অপমানকর ব্যাপার। কারণ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারো গোত্র হয় না। অর্থাৎ সবাই ব্রাহ্মণের জারজ সন্তান। আর কাশ্যপ সম্পর্কে নগন্দ্র নাথ বসুর 'বিশ্বকোষ'-এ পাই--- নগেন্দ্রনাথ বসু/বিশ্বকোষ/৩য় খন্ড/পৃ-৩৫১।

ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। মরীচি ও কলার গর্ভে এঁর জন্ম। মার্কন্ডপুরাণ অনুযায়ী সোমরসজনিত মদ্য হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের (৪/১/১২) মতে কশ্যপ ঋষি দক্ষের ১৭টি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন যথা--- অদিতি

গর্ভে দেবগণ, দিতি গর্ভে দৈত্যগণ, দনুর গর্ভে দানব, কাষ্ঠা গর্ভে অশ্বাদি, অইরষ্টা গর্ভে গন্ধর্বগণ, সুরসা গর্ভে রাক্ষস, ইলা গর্ভে বৃক্ষ, মুনি গর্ভে অপ্সরা, ক্রোধবসার গর্ভে সর্প, তাম্রার গর্ভে শ্যেন, সুরভি গর্ভে গো-মহিষাদি, সরমা গর্ভে শ্বাপদ, তিমি গর্ভে জলজন্তু, বিনতা গর্ভে গড়ুর ও অরুণ, কদ্রুগর্ভে নাগ, পতঙ্গী গর্ভে পতঙ্গ ও যামিনী গর্ভে শলভা। এখানে কশ্যপের নমস নামে কোনও পুত্রের নাম পাওয়া যাচ্ছে না।

অনেকে আবার নমশূদ্রদের 'দেবল ব্রাহ্মণ' বলে দাবি করছেন— গড়ুর কর্তৃক শকদ্বীপ হইতে আনীত বলিয়া ইঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইঁহাদের কুলপঞ্জিকায় উক্ত হইয়াছে যে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক রোগাক্রান্ত হইয়া বৈদ্যগণের চিকিৎসায় সুফল না পাওয়ায় সরযূ নদীর তীরবাসী জপ-যজ্ঞ পরায়ণ দ্বাদশজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া গ্রহ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন ও রোগমুক্ত হন।

রমেশ মজুমদার/বাংলা দেশের ইতিহাস/জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিঃ/১৩৫৬/পৃ-১৭৭।

নগেন্দ্র নাথ বসুর বিশ্বকোষে পাচ্ছি, দেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না এবং এরা হব্য ক্ষেত্রে বর্জনীয় (অষ্টম ভাগ/পৃ-৭৪৭)। যখন দেবল ব্রাহ্মণরাও ব্রাহ্মণদের কাছে গ্রহণীয় নয় তবে এই ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা কেন? আর যদি তাই মানা হয়, তবে তো নমরা বহির্দেশীয়।

আশ্চর্যের বিষয় আজও শিক্ষিত নমরা ব্রাহ্মণ বলে নিজেরা গর্ব অনুভব করে। যেমন ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে 'নমশূদ্র সমাজ সংস্থা' তাদের ৪০ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় 'সভাপতি সম্ভাষণী'তে সংস্থার সভাপতি আনন্দ মোহন মজুমদাব বাবু নিজেকে স্বল্পজ্ঞানী বলে বিনয় প্রকাশ করেছেন, তিনি সভাপতির ভাষণে এইসব যুক্তি দেখিয়ে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবী করেছেন। শুধু আনন্দবাবু নয়, সুনীলকুমার রায়, রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক তাকে তো স্বল্পজ্ঞানী বলা যায় না। তিনি আর এক ব্রাহ্মণ পন্ডিতের সাক্ষ্য তুলে ধরে বলছেন (সোজাকথা সেপ্টেম্বর ২০১৭) মহামহোপাধ্যায় রাসমোহন সার্বভৌম প্রমুখের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে নমোরা হলেন কশ্যপ ঋষির ঔরসে তাঁর ব্রাহ্মণী স্ত্রীর ঋতুমতী অবস্থায় জাত সন্তান। এই ব্যবস্থাপত্রে ৪০জন ব্রাহ্মণ সাক্ষর করেছিলেন। সুনীলবাবু তো ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্বের কথা নিশ্চয়ই জানেন। তাঁর মতো লোক যদি ব্রাহ্মণের দেওয়া বিধানকে মান্যতা দেন তবে ধন্য তাঁর শিক্ষা, ধন্য তার বিচারবুদ্ধি।

নমশূদ্রদের ব্রাহ্মণ হওয়ার পক্ষে এরা একটা যুক্তি দেখান যে নমরা এগার দিনের অশৌচ পালন করে। তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই এই অশৌচ বা শোক পালনের রীতি পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে। যেমন প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যে অশৌচকাল প্রায় সাতদিন, কেহ কেহ ত্রিশ দিনও অশৌচ গ্রহণ করতেন। গি এসবাসীরা ত্রিশ দিন আবার স্পার্টানদের দশদিন অশৌচ গ্রহণের পদ্ধতি ছিল। হিন্দুদের অশৌচের নিয়ম সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের ১০দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন, শূদ্রের এক মাস। চন্ডাল, হাঁড়ি, মুচি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিরা ১০দিন অশৌচ গ্রহণ করে (বিশ্বকোষ ১ম খন্ড পৃ-৬৩২)। এই দিকে দিয়ে দেখতে গেলে নমরা তো চন্ডালই থেকে গেল। সবচেয়ে ব ড় কথা হরি-গুরুচাঁদ সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণির মধ্যে একতা আনতে চেয়েছিলেন এই সিদ্ধান্ত তাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। 'শূদ্রের নমস্য' বলে বা ব্রাহ্মণ বলে অন্য নিপীড়িত জাতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করলেন। ফলে এই নম হওয়ার সিদ্ধান্ত আজ দলিত মুক্তি আন্দোলনের পরিপন্থী। একথা অনেকে বিচার করেছেন তাদের কাছে নমরা প্রকৃত 'বঙ্গ' জাতি।

শিক্ষা:

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে বলে 'অক্ষর' ব্রহ্ম। কোন অক্ষর, না শাসন ক্ষমতায় যিনি প্রতিষ্ঠিত তার 'অক্ষর' বা ভাষা। ব্রাহ্মণ্য শাসনে সংস্কৃতি, অশোকের সময় ব্রাহ্মি বা খরোষ্টি, মুসলমান শাসনে ফার্সি আর ইংরেজের সময় ইংরেজি। শাসক প্রশাসনের কাজ চালাবার জন্য তার ভাষায় অভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ করে। তাই যারা প্রশাসনের খুব কাছে থাকতে চায় তারা শাসকের ভাষা রপ্ত করে। এখানে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। ব্রাহ্মণরা এই কাজে খুব পটু। তারা মুসলমান শাসনে ফার্সি শিখল, ইংরেজি শাসনে ইংরেজি শিখল। গুরুচাঁদ উপলব্ধি করলেন প্রশাসনে না ঢুকলে জাতির উন্নতি নেই। আর প্রশাসনে ঢুকতে গেলে ইংরেজি শিখতে হবে। কারণ প্রশাসনে থাকলে অধিক বেতন, শহুরে বিলাস। গুরুচাঁদ ভেবেছিলেন যারা শিক্ষিত হবে তারা অন্য স্বজাতিদের সাহায্য করবে। সমস্ত কায়িক শ্রমজীবীদের হয়ে আন্দোলন করেছিলেন। যে 'ব্রাহ্মণ' নমশূদ্রদের ইতিহাস লিখেছেন তিনি শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখ ছেন যে ১৯৩০ সালের পর থেকে বর্ধিষ্ণু নমশূদ্ররা কৃষক আন্দোলন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিল। তার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো।

শিক্ষা শুধু সরকারি সার্টিফিকেটের জন্য নয়। সমাজ-দেশ-বিদেশ সম্পর্কে

জ্ঞান আহরণ করা। বিদ্যালয়ে শিক্ষা সীমিত। আরো বৃহত্তর জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগার সেখানে ধর্মের, ইতিহাসের, সাহিত্যের, দর্শনের বই থাকবে। সেই বই পড়ে সমাজের লোক জেগে উঠবে। তা না করে মতুয়ারা মন্দির গড়ে চলেছেন। সেই অন্ধত্বের মধ্যেই সমাজকে ছুঁড়ে ফেলছেন।

অক্ষর পরিচয় নিশ্চয়ই আবশ্যিক। কিন্তু শিক্ষা বললে তো শুধু অক্ষর পরিচয় বুঝায় না। কোনও কিছু শেখাকেই শিক্ষা বলে। আর সবচেয়ে বড় শিক্ষা বাঁচার শিক্ষা। নিজেদের অধিকার কিভাবে পাওয়া যায় সেটা শেখা। কায়িক শ্রম করে যারা জীবন নির্বাহ করে তারা কি অশিক্ষিত? মোটেই না। কৃষিকাজ, মাছ ধরা, কাপড় বোনা, কামার, কুমার সব কাজই শিখতে হয়। কিন্তু সেই শিক্ষাকে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় শিক্ষা বলা হয় না। অথচ তাদের শিক্ষার ফসলে অক্ষর পরিচয়ে শিক্ষিত লোক জীবনধারণ করে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার সাম্য প্রবন্ধে বলেছেন, যারা শ্রম দিয়ে উৎপাদন করে তাঁরা শুধু মজুরী পাবে। প্রয়োজন কারিগরী ও উৎপাদনকারী শিক্ষার দাম আদায়ের, সেটা হয়নি। তাই কয়জন চাষী জেলেকে প্রশাসনে অংশগ্রহণ করিয়ে বৃহত্তর কায়িক শ্রমজীবীদের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয় সেটা শেখার সময় এসেছে।

গুরুচাঁদকে সমাজ থেকে বহিষ্কার:

১৮ নভেম্বর, ২০১৭ প্রশান্ত রায় ফেসবুকে ১৯৮৯ সালের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের লেখা 'নিম্নবর্গের আন্দোলনে গুরুচাঁদ' উদ্ধৃত করে জানায় যে, ঘৃতকান্দির কায়স্থরা, তরাইল ও উলপুর সহ অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা গুরুচাঁদের উপর উঠে পড়ে লাগে। এ কাজে তারা নমশূদ্রদের মধ্য থেকে চৌধুরী, দাস ও টিকাদারদের সঙ্গে পেয়ে যায়। কারণ হিন্দু ধর্মের জাতপাত-বর্ণভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মীয় অনুশাসন-- বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য আগে থেকেই রাগ ছিল চৌধুরী, দাস, টিকাদারদের। এই সুযোগে তারা বর্ণহিন্দুদের সাথে যোগ দিয়ে বিপুল উৎসাহে চারিদিকে গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে অপপ্রচার করতে থাকে। বর্ণ হিন্দুরা শুধু অপপ্রচার করেই ক্ষান্ত থাকে না। ১৯১০ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত গুরুচাঁদ ঠাকুরের বিরুদ্ধে মোট সাতটি মামলা দায়ের করে গোপালগঞ্জ কোর্টে। এর পর ওড়াকান্দি চৌধুরী বাড়িতে কয়েক গ্রামের লোক ডেকে বিচার করে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে ১৩ বছরের জন্য সমাজচ্যুত রাখা হয়।

কিন্তু প্রমথবাবুর আত্মচরিতে পাই (পৃ-৮৬-৮৭) যে ঠাকুরবাড়িতে ১৩০৯

বঙ্গাব্দে (১৯৩৬ খ্রিঃ) প্রথম দূর্গাপূজা হয়। মীড সাহেবের আসার পর কিছুদিন দূর্গাপূজা বন্ধ ছিল। এই সময় গুরুচাঁদের মনে খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা হয়েছিল। (১২৯ পৃ)। তখন শশীভূষণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের কথায় তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। এবং আবার দূর্গাপূজা শুরু করেন ১৯১৭ সালে। গুরুচাঁদ দূর্গাপূজায় সম্মত হয়েছিলেন যখন তাঁর ষাট বছর বয়স। এবং সেটা পুত্রের অনুরোধে। কিন্তু ওড়াকান্দির অন্য নমশূদ্র পরিবারেরা ব্রাহ্মণ্যপ্রথার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তাকে সমাজচ্যুত করেছিলেন তেমন মনে হয় না। কারণ চৌধুরী বাড়ির একজন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি তো আবার ১৯১৭ সালে দূর্গাপূজা করছেন। তবে আরও ছয় বছর তাকে সমাজচ্যুত রাখার কারণ কী? কারণ মনে হয় অন্য কোথাও। হয়তো তাঁর বর্দ্ধিষ্ণু নমদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের জন্য!

১৯৩২ সালে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ মিশন প্রতিষ্ঠা--

ওড়াকান্দির অন্যান্য পরিবার নয়, ঘুন ধরেছিল ঠাকুরবাড়িতেই। মিশন প্রতিষ্ঠিত হলো। ততদিনে হরি-গুরুচাঁদদের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ঠাকুরবাড়িতে দুর্গা, কালী, রাস, রথযাত্রা সমস্ত হিন্দু উৎসব চালু হয়েছে। ব্রাহ্মণদের সমান্তরাল গোঁসাইরা ব্রাহ্মণের কাজ করছেন।

কিছু বিভ্রান্তি-লাল পতাকা

মতুয়া ধর্মের পতাকা লাল, বিপ্লবের পতাকা বলে প্রচার করছেন। ড. পরমানন্দ হালদার কপিলবাবুর বইয়ে লিখলেন (পৃ-১৩০) যে, 'সর্বহারা মন্ত্রমুক্তিদাতা কার্ল মার্কসের পূর্বে যুগাবতার হরিচাঁদ ঠাকুর লাল নিশানের এই বিপ্লব শুরু করেছিলেন'। কিন্তু ঘটনা, মতুয়াদের লাল নিশান তিনকোনা, যা বজরং হনুমানের নিশান হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আর কমিউনিস্টদের লাল পতাকা চতুষ্কোন, যার প্রথম ব্যবহার হয়েছিল ১৭৯১ সালের ১৭ জুলাই। ন্যাশনাল গার্ডের কমান্ডার লাফায়েৎ ফরাসি বিপ্লবের বিরোধীদের সতর্ক করে দেওয়ার জন ব্যবহার করে। তখন হরিচাঁদ কোথায়? ১৮৭১ সালে কমিউনিস্টরা লাল পতাকাকে তাদের পতাকা হিসেবে গ্রহণ করে।

মতুয়া সিংহ ও হাতির প্রতীক

হাতি বাংলার মর্যাদার প্রতীক। আলেকজান্ডার গঙ্গারিডির হস্তিবাহিনীর কথা শুনে আর পূর্বদিকে অগ্রসর হননি, এমন কথাই ঐতিহাসিকেরা বলেন। বহুজন সমাজ পার্টির প্রতীক হাতি। হাতি বৌদ্ধধর্মের প্রতীক। আর সেই হাতিকে

'বাচ্চা' একটা সিংহ আক্রমণ করেছে। সিংহ কার প্রতীক? ব্রিটিশের। তবে এই প্রতীক নিয়ে মতুয়ারা কী বলতে চায় সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।

কুকুরের উচ্ছিষ্ট--

মতুয়া ধর্মকে বেদবিরোধী প্রচার করার জন্য এই কথাগুলি ব্যবহার করা হয়। তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, তারা যদি অঘোর বা বীজমার্গ সম্প্রদায়ের নাম শুনে থাকেন তবে জানতে পারবেন যে অঘোররা মৃত মানুষের মাংস খেতো। আর বীজমার্গের লোকেরা অতিথিকে ডেকে তাদের স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভোগ করিয়ে সেই শুক্র (বীজ) প্রসাদ হিসেবে খেতো। মতুয়ারাই একমাত্র বেদবিরোধী সম্প্রদায় নয় পাঠক সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। একজনের মুখের চিবোনো পান আর একজনের খাওয়া কোনো ভক্তির নিদর্শন নয়। কুকুরের উচ্ছিষ্ট খাওয়া কোনো বড় কথা নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা দরকার।

মৈথিলী ব্রাহ্মণের বংশধর হরিচাঁদ--

কিন্তু যে হরি-গুরুচাঁদ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য বিরোধী সেই হরিচাঁদকে বিষ্ণুর অবতার বানিয়ে দেওয়া হলো। গুরুচাঁদকে শিবের অবতার বানিয়ে দেওয়া হলো। শুধু তাই নয়, হরিচাঁদের পূর্বপুরুষ মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হলো। হরি-গুরুচাঁদ যেখানে পূজার বিরুদ্ধে সোচ্চার সেই বাড়িতে দুর্গা-কালী পূজা, রাস, রথ কী না হচ্ছে? এক কথায় হরি-গুরুচাঁদের সব আন্দোলনে জল ঢেলে দিয়ে মতুয়ারা হিন্দুধর্মে মিশে গেলেন। কিন্তু কেন?

এর উত্তর খুঁজতে অসুবিধা হয় না। কারণ এরা চৈতন্যের অনুসারী। আর বৃহৎ বঙ্গের প্রণেতা দীনেশ সেন কী লিখছেন বৈষ্ণব গোঁসাইদের সম্বন্ধে সেটা একটু দেখি।

'গোঁসাইরা চৈতন্যের মানবিক ধর্মকে অর্থোপার্জনের উপায়ে পরিগণিত করলেন। দীনেশবাবু লিখছেন, ধীরে ধীরে বৈষ্ণব গোঁসাই প্রচুর ক্ষমতা ও লোকশ্রদ্ধা লাভ করিয়া আভিজাতদর্শী ও কতকটা ধর্মের বিকৃত অর্থবাদী হয়ে পড়েন। আমরা বলিতে বাধ্য, চৈতন্য যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন বাংলায় গোস্বামী প্রবর্তিত ধর্ম আর সেই রূপ নাই। চৈতন্যের অশেষ দৈন্য ছিল, তাহাকে কেহ যদি ভগবানের অবতার বলিত তিনি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তাঁকে অবতাররূপে প্রতিপন্ন করার পর গোস্বামীরা নিজেরাও তাঁহার দেবত্বের অংশীদার হইতে দাবি করিলেন। চৈতন্য স্বয়ং বিষ্ণু, নিত্যানন্দ বলরাম, অদ্বৈত সদাশিব...'।

বিস্ফোরক তথ্য দিচ্ছেন অধ্যাপক সত্যরঞ্জন রায় তার লেখা 'আমার লেখা গল্প' বইতে। হরিলীলামৃতের দ্বিতীয় সংস্করণ পি. আর. ঠাকুর বের করেছিলেন ১৯ সালে। কিরণবাবু ওরফে সুশীলকুমার গুপ্ত-বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল। উনিই তৈরি করে দেন হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশপঞ্জী। ঘটনাটা এভাবে লেখা আছে-- (পৃ-৭৩)। আনন্দবাজারের একজন সাংবাদিক আমি একথা পি আর ঠাকুর জানতেন। মাঝে মাঝে ওর সাথে দেখাও হতো। ধীরে ধীরে ওর সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্কও গড়ে ওঠে। একদিন আমার কাছে এসে বললেন-- তারিণীদা আমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। বললাম কী কাজ? উনি ব্যাগ থেকে একটা পাণ্ডুলিপির মতো কী যেন বের করলেন। বললেন, আমি তো আগেও আপনাকে বলেছি শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন আমার ঠাকুর্দা শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের পিতৃদেব, তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ পুরুষ। বহু রকম অলৌকিক ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে। ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি ও তার পার্শ্বস্থ অসংখ্য গ্রামের হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে পুজো করে। তিনি বেঁচে থাকতেই তাঁর এইসব দৈব লীলা ও অলৌকিকত্বের কথা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য হিন্দু সমাজের নীচুতলার মানুষ--- বিশেষ করে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁকে অবতার বলে স্বীকার করে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা হরিচাঁদকে সে মান্যতা দেয় না। নমশূদ্র বলে তাঁকে ঘৃণা করে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সেদিন ঠাকুরমশায় আমার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি যদি হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশতালিকায় একটুখানি পরিবর্তন ঘটিয়ে লিখে দিই যে হরিচাঁদ ঠাকুরের রক্তে কোনও অবাঙালি ব্রাহ্মণের রক্ত বর্তমান আছে তাহলে বাংলার উচ্চবর্ণের মানুষের কাছ থেকে তাঁর অবতারের মান্যতা অনেকটা সহজ হবে। যাই হোক, আমি বিষয়টাকে সম্যক অনুধাবন করলাম। সুতরাং সেদিন প্রমথবাবুর অনুরোধক্রমেই কোনও এক মৈথিলী ব্রাহ্মণের রক্তের সঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশের কোনও এক পূর্বপুরুষের রক্তের (বৈবাহিক সূত্রে) যোগসাধন হয়েছিল হবে সে কথা লিখে দিয়েছি। তারপর থেকেই ...

প্রমথবাবুর সম্বন্ধে আরও কিছু কথা জানাচ্ছি শেখরবাবুর লেখা থেকে নিয়ে।

ঠাকুরনগর - নতুন জায়গা আবিষ্কার

নমশূদ্ররা যখন অনেক লড়াই করে বাস্তব জমি দখল করতে পারল না তখন তারা একটা আধ্যাত্মিক জায়গার খোঁজ করতে লাগল যেখানে তারা নতুন

পরিচয় খুঁজে পাবে। (এই কান্ডটা হচ্ছিল আর একজন নমশূদ্র নেতা প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের মাধ্যমে। তার আন্দোলন মোটেই সনাতনী দলিত রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। এটা বড় মজার যখন যোগেন মন্ডল উদ্বাস্তুদের বাংলার বাইরে পাঠানোর বিরোধিতা করছেন তখন ঠাকুর সরকারের পুনর্বাসন নীতিকে সমর্থন করছেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বাংলার আইনসভায় নির্দলীয় প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন। পরে কংগ্রেসের সমর্থনে গণপরিষদে নির্বাচিত হন। সেখানে তিনি তফসিলদের জন্য সংরক্ষণ না দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ বিলোপ করার জন্য আইন প্রণয়নের কথা বলেন। দেশভাগের পর তিনি ভারতে চলে আসেন এবং নিজের নির্বাচনী এলাকার হারিয়ে রাজনীতি থেকে অবসর নেন।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি উত্তর ২৪ পরগণায় চাঁদপাড়া ও গোবরডাঙ্গার মাঝখানে কিছু জায়গা কেনেন এবং সাত জন ডিরেক্টরকে নিয়ে নিজে চেয়ারম্যান হয়ে 'ঠাকুর ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানি খোলেন। এইভাবে ঠাকুরনগরের যাত্রা শুরু হলো। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উদ্যোগে একটা দলিত উদ্বাস্তু কলোনি তৈরি হলো। পরবর্তী দশ বছরে ৫০ হাজার দলিত উদ্বাস্তু সেখানে বসতি করে । ১৯৫১ সালে ঠাকুর সরকারের কাছ থেকে রাস্তা ও পানীয় জলের সরবরাহের জন্য ৮০ হাজার টাকা অনুদান পায়। ঘর বানানোর জন্য টিন ও ২০০ টাকা করে প্রত্যেক পরিবার পায়।

যা হোক, এসব করার উদ্দেশ্য রাজনীতি নয়, বরং মতুয়া মহাসঙ্ঘ, বৈষ্ণব ধর্মের শাখা উনিশ শতকের প্রথমদিকে যেটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ওনার প্রপিতামহ আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ওনার পিতামহ গুরুচাঁদ ঠাকুর সংগঠিত করেছিলেন সেই সঙ্ঘের গুরুর ভূমিকা পালনের জন্য। ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমেই উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে নমশূদ্রদের সামাজিক প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৩০ সালে প্রমথবাবু মতুয়া সঙ্ঘের প্রধানের পদ অধিকার করেন। ১৯৪৩ সালে এই সঙ্ঘ নিবন্ধীকৃত হয়। তবে প্রমথবাবু উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে সক্রিয় ছিলেন। নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা মহাসম্মেলন ১৯৪৯ সালে ২ জানুয়ারির সভায় বক্তা হিসেবে তাঁর নাম প্রচার করে। ১৯৫০-এর ২১ নভেম্বর ১৫ হাজার উদ্বাস্তুর সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। এইভাবে তিনি ঠাকুরনগর অঞ্চলে তাঁর নির্বাচনী এলাকা তৈরি করেছিলেন। তিনি কংগ্রেসের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। ১৯৫৭ সালে হরিণঘাটা সংরক্ষিত আসনে এবং ১৯৬২ সালে হাঁসখালি সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের টিকিটে তিনি পশ্চিমবঙ্গের

বিধানসভায় নির্বাচিত হন। তিনি আদিবাসী উন্নয়নের রাজ্যমন্ত্রীও হন।

কংগ্রেসের নেতা হিসেবে তিনি নমশূদ্রদের ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি বলতেন, অতীতে তারা পূর্ববঙ্গের বিল ও সুন্দরবন এলাকাকে চাষযোগ্য ভূমিতে পরিণত করেছেন, তারা দন্ডকারণ্য ও আন্দামানে এক নতুন বাংলা তৈরি করবেন। ১৯৫৮ সালে তিনি কম্যুনিস্টদের সমালোচনা করে বলেন, এরা নিজেদের স্বার্থে উদ্বাস্তুদের দন্ডকারন্যে যেতে বাধা দিচ্ছে। অন্য কথায় তিনি ছিলেন তার সম্প্রদায়ের ভোগোলিকভাবে ছড়িয়ে দেবার নীতিতে বিশ্বাসী। তার এই কাজ তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ভালোভাবে নেয়নি।

১৯৬৪ সালে তিনি গান্ধি ও নেহেরুর কাছ থেকে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন তা ভেঙে গেল। ৪ জানুয়ারিতে খুলনায় দাঙ্গা শুরু হয়। পরদিন তা যশোরে পৌঁছে যায়। ডাউন বরিশাল এক্সপ্রেসে করে আঙ্ক তঙ্কিত উদ্বাস্তুরা শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছল। এপারে ১০ জানুয়ারিতে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়। নমশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে কার্ফু ঘোষণা করা হয়। নদীয়ার জেলাশাসক গোলযোগে বন্দি উদ্বাস্তুদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেন। প্রতিবাদে ৬ মার্চ প্রমথবাবু বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবি নিয়ে বিভিন্ন সভাসমিতি করেন। জনগণকে উত্তেজিত করার অপরাধে ১৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত রক্ষা আইনে তাকে গ্রেপ্তার করে। কদিন পরে ৩০ এপ্রিল যোগেন মন্ডলকেও গ্রেপ্তার করে। দুজনকেই ২ জুন পর্যন্ত দমদম জেলে বন্দি রাখা হয়। দুই বিবদমান দলিতনেতার মিলন হলো স্বাধীন ভারতের জেলখানায়। প্রমথবাবুর ছেলে কপিল কৃষ্ণের এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে ১৯৬৪ সালে হাঁসখালি বিধানসভার আসনে উপনির্বচনে তার বাবা কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে মন্ডলকে সমর্থন করেছিলেন। ১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেসের হয়ে তিনি নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীকে ৮৯ হাজার ভোটে পরাজিত করেন। এটাই তার শেষ জয় । এরপর ১৯৭১ এবং ১৯৭৭ সালে সিপিএম প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। এরপর তিনি ধর্মগুরু হিসাবে আন্দামান ও মধ্যপ্রদেশের নমশূদ্রপ্রধান অঞ্চলে ঘোরা শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে মতুয়া মহাসঙ্ঘ হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের আদর্শ প্রচারের জন্য সামাজিক-ধার্মিক সঙ্ঘ হিসাবে নথিভুক্ত হয়। ১৯৯০ সালে তার মৃত্যুর পর তার ছেলে কপিল কৃষ্ণ মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলার অস্তি ৎ

গ্রামে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০৮ সালে সারা ভারতে মতুয়াদের ৬৭৫৫ টি শাখা ছিল। এদের দাবি অনুযায়ী ২০১০ সালে ১০০থেকে ১২০ হাজার পরিবারের পাঁচ লাখ লোক এই সঙ্ঘের সদস্য।

একথা বলা বাহুল্য হরি-গুরুচাঁদের যে আদর্শ নিয়ে নিপীড়িত গায়ে খাটা মানুষদের মুক্তি দেবার কথা ভেবেছিলেন আজ তাঁর বংশধরেরা তাঁদের নাম করে মন্দির বানিয়ে সনাতনী ব্রাহ্মণদের মতো বসে খাওয়ার কাজ করে চলেছেন। মতুয়ারা ডংকা পিটিয়ে মত্ত। তারা শত্রু-মিত্র চিনতে পারছে না। কিছু শিক্ষিত মতুয়া পেশিশক্তির জন্য তাদের ব্যবহার করে। কিন্তু তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে কোনও কথা বলে না।

আজ যখন সারা ভারতে এসসি, এসটি ও ওবিসিরা ব্রাহ্মণবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আম্বেদকরের আদর্শকে সামনে রেখে এক হওয়ার চেষ্টা করছে তখন আম্বেদকরের ছবিকে সামনে রেখে সংরক্ষণের সুবিধা ভোগকারী তপশিলীজাতির অন্তর্ভুক্ত নমশূদ্র জাতির এক অংশ নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নমঃশূদ্র সমাজ সংস্থা। গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘো, মেমোরিয়াল টরাস্ট হলে তাদের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় 'সভাপতি সম্ভাষণী'তে সংস্থার সভাপতি আনন্দ মোহন মজুমদার সেই কথাই জানালেন। তিনি নিজেই জানাচ্ছেন যে, তিনি 'তথাকথিত বিদ্বান হবার তেমন সুয়োগ পাননি।' তা হলে তো 'লিট্‌ল লার্নিং ইস আ ডেঞ্জারাস থিং' বলতে হয়! এবং এরকম একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে না লেখাই উচিত ছিল। যা হোক যখন তপশিল জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন তখন তিনি কেন নমঃশূদ্রদের ব্রাহ্মণ বানাতে চাইলেন সেটাও বোঝা দরকার এবং নমঃশূদ্ররা আদৌ চণ্ডাল না ব্রাহ্মণ সেটা ও দেখা যাক।

মজুমদারবাবু বলছেন যে, নমঃশূদ্ররা বল্লালসেনের সময় 'দেবল ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত ছিল। এরা বল্লালসেনের যজ্ঞ করতে না চাওয়ায় বল্লাল তাদের উপর অত্যাচার শুরু করে। তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। বেঁচে থাকার তাগিদে চাষ-বাস শুরু করে।

এখন দেখি 'দেবল ব্রাহ্মণ' সম্বন্ধে শাস্ত্র (যেহেতু মজুমদারবাবু ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র মানেন) কী বলছে।

দেবল ব্রাহ্মণঃ--

গরুড় কর্তৃক শকদ্বীপ হইতে আনীত বলিয়া ইহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেন। ইহাদের কুলপঞ্জিকায় উক্ত হইয়াছে যে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক রোগাক্রান্ত হইয়া বৈদ্যগণের চিকিৎসায় সুফল না পাওয়ায় সরযূ নদীর তীরবাসী জপ-যজ্ঞ পরায়ণ দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া গ্রহ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন ও রোগমুক্ত হন।

রমেশ মজুমদার/বাংলা দেশের ইতিহাস/জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিঃ/১৩৫৬/পৃঃ ১৭৭

নগেন্দ্র নাথ বসুর বিশ্বকোষে পাচ্ছি 'দেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না এবং এরা হব্যক্ষেত্রে বর্জনীয়। (অষ্টম ভাগ পৃঃ ৭৪৭) যখন দেবল ব্রাহ্মণরাও ব্রাহ্মণদের কাছে গ্রহণীয় নয় তবে এই ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা কেন?

মজুমদারবাবুর দ্বিতীয় যুক্তি ফরিদপুর জেলার মল্লিকপুর গ্রামের শ্যামচরণ তর্কালঙ্কার এর বাড়ি থেকে পাওয়া 'শক্তি সঙ্গম তন্ত্র'-এ পাওয়া নমস মুনির গল্প। (পৃ-২৫)এই একই গল্প পাওয়া যায় গৌর প্রিয় সরকারের 'জাতিতত্ত্ব' বইতে। বইটা রাজু দাস আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে তুলে ধরছি।--

'নমস্ নামে একজন মুনি ছিলেন। তার স্ত্রী ছিলেন সুলোচনা দেবী। সুলোচনাদেবী গর্ভধারণ করলে নমস্ গৃহত্যাগ করে। যথাকালে দুই ছেলে জন্ম নেয়। তাদের ছয় মাস বয়সে তাদের মা মারা যান। চোদ্দ বছর পর নমস ঘরে ফেরে এবং তার ছেলেদের উপনয়ণের জন্য সচেষ্টা হন। কিন্তু চোদ্দ বছরের মধ্যে উপনয়ণ না হওয়ায় কেউ ত াদের উপনয়ণ সংস্কার করতে রাজী হল না। অগত্যা নমস্ আবার গৃহত্যাগী হলেন। বাবাকে ফিরতে না দেখে দুই ছেলে বাবার খোঁজে দেশ বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে সীমান্ত নামে জনৈক শূদ্র রাজার রাজ্যে পৌঁছান। রাজা সীমন্ত তাঁর নিজের দুই মেয়ের সাথে এদের বিয়ে দিলেন। এদের সন্তানেরা 'নমঃশূদ্র' নামে খ্যাত হয়। আর নমস্ মুনির পিতা ছিলেন কশ্যপ। তাই নমঃশূদ্রদের গোত্র 'কাশ্যপ'।

এ ছাড়াও দাবী করা হয় যে, ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাজাত সম্প্রদায়ও শাস্ত্রমতে এক শ্রেণির ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত। সেজন্য শৌচ-অশৌচ, শ্রাদ্ধ-বিবাহ, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি সব প্রকার বৈদিক ক্রিয়াকর্মে নমোদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-আচার বিদ্যমান আছে। দশ দিনে অশৌচানান্ত, এটা ব্রাহ্মণের রীতি।

এখন যদি প্রশ্ন করি এই নমস মুনির ঘটনা কত সালে? ব্রাহ্মণরা বাংলায়

কবে এল? দশ দিনে অশৌচ কাদের কাদের হয়?

প্রথমে আলোচনা করি তন্ত্র ভারতে কবে এল?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (কমলচৌধুরী সম্পাদিত বাঙ্গালার ইতিহাস, দে'জ পাব্লিশিং ২০১০ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা-৫২৩) বলছেন তন্ত্র ভারতের বাইরে থেকে এসেছে।

'আমার বোধহয়, খ্রিঃ ৭ম ও ৮ম শতকে যখন উম্মেদিয়া ও আব্বাসিয়া খালিফাগণ তুর্কিস্তানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন, তখন সেখানে নানা রকমের লোক-চালিত ধর্ম ছিল। তাহারা সে সকল ধর্ম নষ্ট করায় তাহাদের পুরোহিতরা পলাইয়া ভারতে আসেন, তাহারাই তন্ত্র এ দেশে প্রচার করেন। তখন ভারতে কোথাও তন্ত্র ছিল না, তাহার কারণ জলন্ধর, কামাখ্যা, ওড়িয়ান, পূর্ণা, শ্রীপর্বত এই সকল স্থান হইতে ভারতবর্ষে নানা দেশে উহার প্রচার করা হয়। আমার মনে হয়, এই তন্ত্রের গোড়া। তন্ত্র শব্দ পূর্বে ছিল। বরাহ মিহিরের টীকাকার ভট্ট উৎপল নানা তন্ত্রের নাম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সব জ্যোতিষের নাম। দ্বিতীয় সমস্যা শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্রমাতার সন্তানের জাত কী নির্দেশ করে। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্রমাতার সন্তানের জাতি 'পরাশর' বলে নির্দিষ্ট করেছেন।

মজুমদার বাবু নিশ্চয়ই 'শক্তিসংগম তন্ত্র' কে মহাভারতের উপরে স্থান দেবেন না। বিশেষ করে যখন তন্ত্র ভারতে এসেছে মাত্র সপ্তম শতকে। সে ক্ষেত্রে ন মে াদের পরাশর বলা যেতে পারে যেহেতু ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাণীর সন্তানের জাতি পরিচয় পরাশর। অবশ্য মহাভারতের লেখক ব্যাসদেব নিজে পিতা ব্রাহ্মণ পরাশর ও শূদ্রানী মাতা সত্যবতীর সন্তান। জাতি পরাশর। তিনি কেন নিজে ব্রাহ্মণত্বের দাবি করলেন না? এ নিয়ে ভাবা দরকার।

এরপর ভাবা দ রকার কশ্যপের পুত্র নম্ এ তথ্য কতদূর সত্য?

ব্রাহ্মণত্ব কারা নির্ধারণ করে? 'শক্তি সঙ্গম তন্ত্র' কী টাকা দিয়ে বানানো?

গল্পটির উৎস জীবন জোদ্দার। ১৮৮৭ সালে তিনি খরচে জঙ্গল পরিষ্কার করে মাটি কেটে নীচু এলাকা ভরাট করে খুলনা থেকে দৌলতপুর হয়ে সাতক্ষীরা যাবার রাস্তা বানিয়ে দেন। সরকার তাকে ডেকে খরচের টাকা দিতে চান। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। তখন সরকার আরও খুশী হয়ে খুলনার উন্নয়নমূলক কাজে তত্ত্বাবধানের জন্য গঠিত 'ডেভালেপমেন্ট কমিটিতে' সম্মানিত সদস্য হিসাবে মনোনীত করেন। তখন ডেভালেপমেন্ট কমিটিতে সমস্ত সদস্য ছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য নয়তো কায়স্থ। তারা জীবনবাবুকে কমিটিতে

অন্তর্ভুক্তি ঠেকানোর সব রকম চেষ্টা করতে লাগলো। পরবর্তী সভায় জাত সম্পর্কে সাহেবের কাছে অভিযোগ করে বলল, জোদ্দার মহাশয় জাতিতে নমঃশূদ্র, ধর্মহীন, নিকৃষ্ট ও চণ্ডাল। এমন লোকের সাথে বসা যায় না। সাহেব জীবনবাবুর বক্তব্য শুনতে চান। জীবনবাবু ছয় মাসের সময় নিয়ে চলে আসেন।

জীবনবাবু দেশের জ্ঞানী-গুণী লোকের শরনাপন্ন হতে লাগলেন। উপযুক্ত উত্তর দানের জন্য ওড়াকান্দীর ভজরাম চৌধুরী, চৈতন্য বিশ্বাস, পাকীর ডাঙার স্বরূপ রায়, হরিদাসপুরের হরমোহন টিকাদার, খাটরার নদেরচাঁদ বিশ্বাস ও হরিচরণ রায়, মাইগ্রামের ঝড়ুরাম বিশ্বাস, যশোর জেলার ঈশ্বর চন্দ্র মণ্ডল, খুননার চৈতন্য বিশ্বাস, দত্তডাঙার তপস্বীরাম পাইন, গোড়ানালুয়ার যশোবন্ত বাজ, সচিয়াদহের উমাচরণ বিশ্বাস ও জয়চাঁদ বিশ্বাস ইত্যাদিদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হল। তারা স্বজাতির ইতিহাস খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। সবাই গেলেন ওড়াকান্দির গুরুচরণের কাছে। তিনি শ্যামাচরণ তর্কালঙ্কারের খোঁজ দেন। আবিষ্কার হয় 'শক্তি সঙ্গম তন্ত্র'।

ঘটনাটা নিয়ে ভালো করে দেখলে বোঝা যায় যারা কমিটিতে ছিলেন প্রত্যেকেই আর্থিক দিক দিয়ে সম্পন্ন। আর ব্রাহ্মণরা টাকা পেলে যা কিছু লিখে দিতে পারে। মিথ্যা কথা বলায় তাদের কোন জুড়ি নেই। হুনদের রাজপুত বানাতে তারা 'পৃথিরাজ রস' লিখল। টাকা খেয়ে শিবাজীকে ক্ষত্রিয় বানিয়ে দিল। আগামবাগিশ সম্পাদিত বৃহৎতন্ত্রসারে এই তন্ত্রের নাম নেই/ তন্ত্র ভারতে এসেছে অনেক পরে। তাই একথা মানতে কষ্ট হয় না যে শ্যামাচরণ টাকা নিয়ে পাঁচ মাস ধরে এই শাস্ত্র রচনা করেছেন। এই ভাবে শাস্ত্র রচনা সেদিন আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির একটা কৌশল হতে পারে কিন্তু আজ যখন সংরক্ষণের মাধ্যমে সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে আসন পাওয়ার অধিকার সুরক্ষিত তখন এই গল্প বলে কী লাভ?

আনন্দমোহনবাবু নিজেকে স্বল্পজ্ঞানী বলে বিনয় প্রকাশ করেছেন কিন্তু সুনীলকুমার রায় রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক তাকে তো স্বল্পজ্ঞানী বলা যায় না। তিনি আর এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাক্ষ্য তুলে ধরে বলছেন, (সোজাকথা-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭) মহামহোপাধ্যায় রাসমোহন সার্বভৌম প্রমুখের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে নমোরা হলেন কশ্যপ ঋষির ঔরসে তাঁর ব্রাহ্মণী স্ত্রীর ঋতুমতী অবস্থায় জাত সন্তানের বংশ। এই ব্যবস্থাপত্রে ৪০জন ব্রাহ্মণ সাক্ষর করেছিলেন। সুনীলবাবু তো ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্বের কথা নিশ্চয়ই জানেন। তার

মতো লোক যদি ব্রাহ্মণের দেওয়া বিধানকে মান্যতা দেয় তবে ধন্য তার শিক্ষা ধন্য তার বিচারবুদ্ধি।

যা হোক, আমরা শাস্ত্রে কশ্যপ ঋষির সম্বন্ধে কী লেখা আছে সেটা একটু দেখি।

নগেন্দ্রনাথ বসু/বিশ্বকোষ/তৃতীয় খণ্ড/পৃ-৩৫১)

ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি ও কলার গর্ভে ইহার জন্ম। মার্কণ্ডপুরাণ অনুযায়ী সোমরসজনিত মদ্য হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের (৪/১/১২) মতে কাশ্যপ ঋষি দক্ষের ১৭টি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; যথা--- অদিতি, গর্ভে দেবগণ, দিতি গর্ভে দৈত্যগণ, দনুর গর্ভে দানব, কাষ্ঠা গর্ভে অশ্বাদি, অরিষ্টা গর্ভে গন্ধর্বগণ, সুরসা গর্ভে রাক্ষস, ইলা গর্ভে বৃক্ষ, মুনি গর্ভে অপ্সরা, ক্রোধবসার গর্ভে সর্ব, তাম্রার গর্ভে শ্যেন, সুরভি গর্ভে গো মহিষাদি, সরমাগর্ভে শ্বাপদ, তিমি গর্ভে জলজন্তু, বিনতা গর্ভে গরুড় ও অরুণ, কদ্রুগর্ভে নাগ, পতঙ্গী গর্ভে পতঙ্গ ও যামিনী গর্ভে শলভ।

এখানে কাশ্যপের নমস নামে কোনও পুত্রের নাম পাওয়া যাচ্ছে না। সুনীলবাবু আর আনন্দবাবুই ভাগবতকে বাতিল করে শক্তিসঙ্গম তন্ত্রকে প্রাধান্য দেবেন?

নমশূদ্রদের ব্রাহ্মণ হওয়ার সপক্ষে ১১ দিনের অশৌচ পালন করার যুক্তিও অনেকে দেখান। তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই এই অশৌচ বা শোকপালনের রীতি পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে। যেমন--- 'প্রাচনী ইহুদীদের মধ্যে অশৌচকাল প্রায় সাত দিন, কেহ কেহ ত্রিশ দিনও অশৌচ গ্রহণ করতেন। গ্রীস দেশবাসীরা ত্রিশ দিন আবার স্পার্টানদের দশ দিন অশৌচ গ্রহণের পদ্ধতি ছিল। হিন্দুদের অশৌচের নিয়ম--- সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের দশ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন, শূদ্রের এক মাস। চণ্ডাল, হাঁড়ি, মুচি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিরা দশদিন অশৌচ গ্রহণ করে (বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ- ৬৩২)।

এ তো কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাওয়া। নমশূদ্ররা তবে তো শূদ্র নয়। তারা চণ্ডাল নাম পাল্টে শূদ্র হলো কিন্তু শূদ্রের তো ৩০ দিন শৌচ থাকার কথা। তবে কি এই দিক দিয়ে তারা চণ্ডাল রয়ে গেল?

নমদের ব্রাহ্মণ মনে করায় আর একটা সংশয় যে বৈদিক ব্যবস্থা বাংলায় এসেছে গুপ্তকালে। এবং নীহাররঞ্জন রায় বলছেন যে, এই আর্যকরণ সহজে হয় নাই। উদ্ধৃত করছি--- আর্যকরণের সূচনা

বাংলাদেশ উত্তরভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ; আর্য-ব্রাহ্মণ সংস্কার ও সংস্কৃতির স্পর্শ ও প্রভাব এদেশকে আক্রমণ করিয়াছে সকলের পরে; তখন তাহা উত্তর ভারতেআর প্রায় সর্বত্র বিজয়ী, সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিমান। অন্যদিকে, তখন সমগ্র বাংলাদেশে আর্যপূর্ব সংস্কার ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বিচিত্র কৌমদের বাস; তাহারাও কম শক্তিমান নয়। তাহাদের নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতিবোধ গভীর ও ব্যাপক। কাজেই এই দেশে আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিজয়াভিযান বিনা বিরোধ ও বিনা সংঘর্ষে সম্পন্ন হয় নাই।

নীহার রঞ্জন রায়/বাঙলার ইতিহাস/ আদিপর্ব/ দে'জ পাব্লিশিং/১৪০২ পৃ-২১৬

তবে কি নমশূদ্ররাও এই আদিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তারাও কি ভিনদেশী। এদিকে যারা মূলনিবাসী তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা বহির্দেশী বলে আসছেন তারাও কি নমশূদ্রদের বহির্দেশী বলবেন?

এই লড়াইয়ে পরাজিত জাতিকে চতুর্বর্ণ কাঠামোয় ফেলার প্রচেষ্টা সেই থেকে চলে আসছে। নীহারবাবুর কথায়-- বর্ণাশ্রম প্রথা ও অভ্যাস যুক্তি পদ্ধতিবদ্ধ করিয়াছিলেন প রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের লেখকরা।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে তাঁহারা সমস্ত ব্যবস্থাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চতুর্বর্ণ প্রথা অলীক উপন্যাস এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, ভারতবর্ষে এই চতুর্বর্ণের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন, কৌম বিদ্যমান ছিল; প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কৌমের স্তর উপস্তর ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে এবং সবকিছুকেই আদি চতুর্বর্ণের কাঠামোর যুক্তিপদ্ধতিতে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মনু-যাজ্ঞবল্কের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকেরঘুনন্দন পর্যন্ত চেষ্টার বিরাম নাই।

নীহার রঞ্জন রায়/বাঙলার ইতিহাস/ আদিপর্ব/ দে'জ পাব্লিশিং/১৪০২ পৃ-২০৯

তাই কি নমশূদ্র জাগরণের অন্যতম নেতা হরিদাস বলেছিলেন--

'তুইত বিশ্বাস; আমি বড় অবিশ্বাস। তন্ত্রে-মন্ত্রে শৌচাচারে না হয় বিশ্বাস। ... স্নান পূজা সন্ধ্যাহ্নিক মোর নাহি ঠিক। কুকুরের উচ্ছিষ্ট পেলে খাই। বেদবিধি শৌচাচার নাহি মানি ঠাঁই।'

অথচ এই আনন্দমোহন বাবু আবার হরিচাঁদের ভক্ত, যে হরিচাঁদ তন্ত্র

মানেন না। তবে হরিচাঁদের ভক্ত হয়ে তিনি তন্ত্রের ওপর বিশ্বাস করে কথা বলেছেন। এটা সেই বৈষ্ণবদের মতো অবস্থা। দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর বৃহৎ বঙ্গে লিখছেন--

'ধীরে ধীরে বৈষ্ণব গোঁসাই প্রচুর ক্ষমতা ও লোকশ্রদ্ধা লাভ করিয়া অভিজাত দর্শী ও কতকটা ধর্মের বিকৃত অর্থবাদী হয়ে পড়েন। আমরা বলিতে বাধ্য, চৈতন্য যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বাংলায় গোস্বামী প্রবর্তিত ধর্ম আর সেরূপ নাই। চৈতন্যের অশেষ দৈন্য ছিল, তাহাকে যদি কেউ ভগবানের অবতার বলিত, তিনি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন।

চৈতন্যদেবকে ভগবান রূপে প্রতিপন্ন করার পর গোস্বামীরা নিজেরাও তাঁহার দেবত্বের অংশীদার হইতে দাবি করিলেন। চৈতন্য স্বয়ং বিষ্ণু, নিত্যানন্দ বলরাম, অদ্বৈত সদাশিব'।

বৈষ্ণব কীর্তন গায়ক তা রক সরকার যখন হরিদাসের কাছে হরিলীলামৃত নিয়ে আসেন তিনি শুধু ক্ষুব্ধই হননি, তিনি লেখককে কুষ্ঠ হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। এত ভক্ত, তাদের কাছ থেকে বৈষ্ণব পদ্ধতিতে অর্থোপার্জনের পথ কে ছাড়তে পারে? তাই হরিদাসকে অবতার বানানো হল। বিষ্ণু-বুদ্ধ-নিমাই-হরিদাস; ত ার মাও সেইভাবে পুনর্জীবন নিয়ে আসছেন। আবার যিনি বিষ্ণুর অবতার তাকেই বলা হল পূর্ণব্রহ্ম। যে বুদ্ধ অবতারবাদের বিরোধী, তাকেও বিষ্ণুর অবতার বানিয়ে বৌদ্ধদের কাছে টানার চেষ্টা করা হল। হীরামন হলেন হনুমানের অবতার। যে হরিদাস বৈদিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন তাকেই বৈদিক ব্যবস্থার ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হল। জিত হল ব্রাহ্মণদের। তাই তার শিষ্যদের আজ ব্রাহ্মণ হওয়ার বড় আগ্রহ। কিন্তু ব্রাহ্মণ হতে চাইলেন কি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যপ্রথা কোন জন্মসূত্রে পাওয়া অধিকার নয়। রাষ্ট্র বা ব্যবস্থা স্বীকৃতি দিলে তবেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়।

আর ব্রাহ্মণদের সন্তান হলেই যে ব্রাহ্মণ হবে এমন কথা শাস্ত্র বলে না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আইন মনুস্মৃতি। এক জন ব্রাহ্মণ কী করে তার ব্রাহ্মণত্ব হারায় সে সম্পর্কে কী বলছেন মনুস্মৃতি।

ব্রাহ্মণত্ব কী করে নষ্ট হয়?

২/৩৯ এর পর ওই তিন বর্ণের যুবকেরা, যাদের যথাযথ সময়ে উপনয়ন

হয়নি তারা ব্রাত্য বলে পরিগণিত হবে এবং সমাজে ধিকৃত হবে।

৫/১৯ যে জ্ঞানত ছত্রাক (মাশরুম), গ্রাম্য শূকর, রসুন, গ্রাম্য মুরগি খায় সে জাতিচ্যুত হবে।

২/১০৩ কিন্তু যে সকলে দাঁড়িয়ে বা সন্ধ্যায় বসে পূজা করে না তাকে শূদ্রের মত সমাজের সমস্ত কর্তব্য ও অধিকার থেকে বহিষ্কার করা হবে।

২/১৬৮ একজন দ্বিজ বেদ পড়ে অন্য বৈষয়িক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সে তার বংশধরদের সাথে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়।

৩/১৭ যে ব্রাহ্মণ শূদ্রনারীকে শয্যায় গ্রহণ করে সে নরকে পতিত হয়। যদি কোন সন্তান হয় তবে সে ব্রাহ্মণের মর্যাদা পাবে না।

৪/৬১ যেখানে শূদ্র রাজত্ব করে, যে স্থান অনধিকারীর অধীন, অন্য ধর্মাবলম্বী অথবা নিম্নজাতের লোকে পরিপূর্ণ সেখানে ব্রাহ্মণরা থাকবে না।

৪/৭৯ অজাত, চণ্ডাল, পিচাশ, মুর্খ, নীচুজাতের লোকের সাথে বসবাস করবে না।

শূদ্রকে উপদেশ, খাদ্য-উচ্ছিষ্ট, পূজার প্রসাদের পরিত্যক্ত অংশ দেবে না। তাঁকে ধর্মাপদেশ দেবে না প্রায়শ্চিত্ত করাবে না।

৪/৮১ করালে সে অসমবৃত নরকে পতিত হবে।

৪/৮৪ যে রাজা ক্ষত্রিয় বংশজাত নয় সেই রাজা, কসাই, তেলি, মদ্যব্যবসায়ী অথবা বেশ্যার অর্থে যে প্রতিপালিত তাদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করবে না।

৪/১৪০ খুব সকালে, সন্ধ্যার পর অথবা মধ্যাহ্নে একাকী বা অচেনা ব্যক্তি বা একজন শূদ্রের সাথে যাত্রা করবে না।

৮/১০২ যে ব্রাহ্মণেরা গরু চরায়, ব্যবসা করে, মেরামতির কাজ করে, অভিনেতা বা গায়ক অথবা কায়িক শ্রম করে বিচারক তাদেরকে শূদ্র হিসাবে গণ্য করবেন।

১০/২০ যে সন্তানেরা দ্বিজদের স্বজাতীয় স্ত্রীর গর্ভ হইতে জাত তাঁরা বিধিবদ্ধ পবিত্র কর্তব্য না করলে সাবিত্রী থেকে বঞ্চিত হবে এবং তাদের ব্রাত্য বলা হবে।

এ ছাড়াও আমরা কালা পাহাড়ের গল্প জানি, জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের 'পিরালী' হওয়ার ঘটনা। সিরাজের আমলে জাতে বৈদ্য রাজবল্লভ কাশী, কাঞ্চী দ্রাবিড় থেকে পণ্ডিত আনিয়ে বৈদ্যদের উপবীত ধারণের চেষ্টা করলে নবদ্বীপের মহারাজ (জমিদার) কৃষ্ণচন্দ্র রায় তার রাজসভায় বৈদ্যদের

পৈতা পরে ঢোকা বন্ধ করে দেন। পেটের দায় বড় দায় বৈদ্যদের পৈতা পরা হলো না। বল্লালসেনের সময় তৈরি করা হয় ঘটক সম্প্রদায়। তারা টাকা খেয়ে জাত বিক্রি করত। ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা চালু হওয়া পর্যন্ত জমিদাররা বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করত। এমনকি ইংরেজরাও সিপাহী বিদ্রোহেপর এদেশের ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন সংস্কার গ্রহণ করেনি। কিন্তু ব্রাহ্মণরা তাদের আধিপত্য স্থায়ী রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় আর তাই হয়তো তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেদের এই জাতে উঠে মর্যাদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা।

নমশূদ্ররা ব্রাহ্মণ হতে পারলো না। নমশূদ্র পরিচয়ের আগে তাদের কী পরিচয় ছিল? সেটা কি খুব নিন্দার? সেটা নিয়ে এবার একটু ভাবি।

১৮৭১ সালে ভারতে প্রথম আদমসুমারী হয়। তখন জনগণনায় ত াদের জাতি পরিচয় লেখা থাকতো। ১৮৭২, ১৮৮১ সালে তাদের পরিচয় ছিল 'চণ্ডাল', ১৮৯১তে হয় 'নমশূদ্র অথবা চণ্ডাল'; ১৯০১ নমশূদ্র (চণ্ডাল), ১৯১১ সালে নমশূদ্র (চণ্ডাল বাদ পড়ল)। কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই গেল চণ্ডাল পরিচয়ের থেকে নমশূদ্র পরিচয় কি অধিক সম্মানের?

এবার দেখি চণ্ডাল কারা? চণ্ডাল অপমানকর কেন?

নগেন্দ্র নাথ বসু সংকলিত বিশ্বকোষের ষষ্ঠ খণ্ড ৮৮ পৃষ্ঠায় পাই–

'ঢাকাবাসী চণ্ডালদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে তাহারা পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিল, শূদ্রের সহিত একত্র ভোজন করায় এরূপ অবনতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাহারা আরও বলে যে গয়াবাসী গোবর্ধন চণ্ডালেরা তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। ত াহারা উক্ত প্রদেশ হইতে এইখানে আসিয়াছে। তাহারা প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণদিগের দাস ছিল, কারণ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণদিগের শ্রাদ্ধাদির অনুকরণে ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিতে দেখা যায়। গয়ালীরা বঙ্গীয় চণ্ডালের পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ায় কোনরূপ দান গ্রহণ করেন না। এতদ্ব্যতীত আরও একটি প্রবাদ আছে যে রঘুকুল পুরোহিত বশিষ্টদেবের পুত্র রামদেব রাজা দশরথকে যজ্ঞীয় কুম্ভ হইতে শান্তিজল প্রদানের সময় ভ্রমক্রমে কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করায় পিতৃশাপে এইরূপ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন।

ফরিদপুর অঞ্চলের চণ্ডালদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে– পূর্ব্বকালে তাহারা উচ্চ হিন্দুসমাজে গৃহীত ছিল। তাহাদের সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই স্থান পাইত। পরে ঢাকায় কতকগুলি দুষ্ট ব্রাহ্মণের উত্তেজনায় তাহারা সমাজচ্যুত

হয় ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ফরিদপুর, যশোর, বাকরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকে।

বঙ্গদেসে পূর্ব্বকালে চণ্ডালের বেশ প্রাদুর্ভাব ছিল, ভাওয়ালের জঙ্গলে চণ্ডালরাজদিগের বৃহৎ দুর্গের আজও ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

বর্দ্ধমান প্রভৃতি কোন কোন স্থানের চণ্ডালেরা আপনাদিগকে লোমশ বা নোমশ ঋষির সন্তান ও নমশূদ্র নামে পরিচয় দেয়। এই নমশূদ্র নাম শুনিয়া কেহ কেহ ইহাদের শূদ্রের নমস্য বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু তাহা নহে, নমন অথবা াবনত শূদ্র বলিয়া ইহাদের নাম নমশূদ্র হইয়াছে।'

'চণ্ডাল' শব্দের উৎপত্তি?

'ভারতবর্ষ ও বৃহত্তরভারতের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থে শ্রী উপেন্দ্র বিশ্বাস চণ্ডাল শব্দের উৎপত্তি খোঁজ করতে গিয়ে বলেছেন-- কর্ণধার শব্দ থেকে কাণ্ডার-- কাঁড়াল-চণ্ডাল-(চণ্ডাল-চাঁড়াল) এই ভাবে দেখিয়েছেন। (পৃ-৩৪১) লেখ ক বলেছেন যে চণ্ডাল প্রথমে সম্ভ্রমবাচক শব্দ ছিল। আমরা দেখি রাম গুহক চণ্ডালের সাথে আলিঙ্গন করছেন। শান্তনু কাণ্ডারী কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করছেন। লেখক বলছেন, 'ভারতবর্ষে অসুর পক্ষের চূড়ান্ত পরাজয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে (১৪০০ খ্রিঃপূঃ) ঘটিয়াছিল এবং তাহার পর অসুরপক্ষীয় ধর্মনেতা ও রাষ্ট্রনেতাগণের নিধন বা দেশত্যাগের ফলে চণ্ডালগণ বহুলাংশে ব্রাহ্মণ্যধর্মী সমাজপতিগণের অনুগ্রহের বা কৃপার পাত্র হইয়া পড়িলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মীগণ লিখিত গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, 'চণ্ডালগণ' বহুকাল পর্যন্ত একটি 'ব্রাহ্মণ-বিরোধী' ও 'বেয়াড়া' সম্প্রদায় হিসাবে চলিয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মীসমাজের অন্যান্য সম্প্রদায় যেরূপ ভাবে ব্রাহ্মণগণের নির্দেশ বা উপদেশ মানিয়া নির্বিবাদে মানিয়া চলিত চণ্ডালগণ কখনো তাহা করে নাই।

'বঙ্গদেশীয় নমশূদ্র নামধেয় সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্বরূপ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহাকুমার অন্তর্গত ওরাকান্দী গ্রামে 'হরিঠাকুর' নামে প্রসিদ্ধ এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী অবলম্বনে যিনি 'হরিলীলামৃত' নামক একটি জীবনীকাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল 'তারক চন্দ্র কাঁড়ার'। বস্তুতঃ তাঁহার এই পদবী কৌলিক উপাধিও বটে এবং সম্প্রদায়ের আখ্যাও বটে এবং সম্প্রদায়ের আখ্যাও বটে। আবার ডঃ অনীল বিশ্বাস তাঁর 'দি নমশূদ্রজ-- অরিজিন অ্যান্ড ডেভারেলপমেন্ট' বইতে লিখ ছেন, পৃ-১২২, 'বিবর্তনের পথ ধরে আমরা এগোলে দেখতে পাই গণ্ডারিড

অর্থাৎ গোল্ড তারপর চাণ্ডেলা রাজপুত থেকে চণ্ডাল (নমশূদ্ররা) তারপর পালেরা। পালেরা ছিল সূর্য বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজপুত, হিন্দু ধরনের বৌদ্ধ ধর্ম মানতো। অতএব এটা মনে করা যেতে পারে নমশূদ্ররা পাল ও ক্ষত্রিয় ছিল।

আবার উপেন্দর সিং/এ হিস্টোরি ওব এনসিয়েন্ট অ্যান্ড আর্লি মিডিয়াভেল ইন্ডিয়া/২০১৫ পৃ-৫৬৮-এ পাই চাণ্ডেলরা যারা বুন্দেলখণ্ডে তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা ৩৬টা রাজপুতদের একজন ছিল। তাদের অভিলিখন থেকে জানা যায় যে, তাদের পৌরাণিক পুর্বপুরুষ চন্দ্রাত্রেয়, চাঁদ থেকে উৎপত্তি। এই বংশের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠাতা নান্নুকাকে নবম শতকের প্রথমভাগে রাখা যায়। অভিলেখে তাদের বংশের আগের রাজা খার্জুরাহক (খাজুরাহো)-র সাথে সংযুক্ত করে, যেটা নান্নুকার রাজধানী ছিল। চাণ্ডেলরা প্রথম দিকে কানৌজ-এর প্রতিহারদের সামন্ত রাজা ছিল বলে মনে হয় এবং তাদের সাথে ও পাল ও কালচুরিদের সংঘর্ষ বাধে। জয়শক্তি, বিজয়শক্তি ও পরে হর্ষের সময়ে চাণ্ডেল রাজত্ব ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। প্রতিহার ও পালরা দুর্বল হয়ে পড়লে সেই সুযোগ চাণ্ডেলরা নেয়। চাণ্ডেলদের প্রথম স্বাধীন রাজার নাম ঢং, তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন তার সময়ে খাজুরাহো মন্দির তৈরি হয়।

এখানে দেখছি চাণ্ডেলদের সাথে পালদের লড়াই। আবার স্মিথ বলছেন রাজপুতরা বহিরাগত হূনদের বংশধর। আর অনীলবাবু পালদের সূর্য বংশের বলছেন আর উপেন্দ্র সিং চাণ্ডেলদের চন্দ্র বংশীয় বলছেন। তবে বাংলার চণ্ডালদের সাথে বুন্দেলখণ্ড বা খাজুরাহের চাণ্ডেলদের এক করে দেখানো যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

এবার দেখি চণ্ডাল থেকে নমশূদ্র কী করে হলো। মহানন্দ হালদার রচিত 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত'/১৯৯৮/পৃ-২৯

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রাজা শ্রী বল্লাল মহাতেজা
রাজ্যমধ্যে করিল ঘোষণা
বঙ্গভূমি পূণ্যস্থান বৌদ্ধ হ'ল অন্তর্দ্ধান
বৌদ্ধ ধর্মে কেহ থাকিবে না।
এবে নমশূদ্র যারা সকলি ব্রাহ্মণ তারা
বৌদ্ধ ধর্মে নিয়েছিল দীক্ষা।

যজ্ঞ সূত্র গলে নাই জাতি ব'লে 'কিবা ছাই'
শূদ্রভাব এই মাত্র দেখি
শূদ্রের নমস্য বটে বলি আমি অকপটে
নমঃশূদ্র নাম তাই রাখি।
পৃঃ ২৩৮
বল্লালের কোপে পড়ে রাজ্য রাজধানী ছেড়ে
বৌদ্ধধর্মী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ
হিন্দু ধর্মী ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধ ধর্ম করি সারা
হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করিল।
সুমন্তির মন্ত্রনায় যতজন রক্ষা পায়
রাজাজ্ঞায় নমঃশূদ্র হ'ল।

আর চণ্ডাল সম্পর্কে কী বলছেন?

গ্রামের বাহিরে বাস নাহি করে চাষবাস
মৃতদেহ শ্মশানে পোড়ায়।
মৃত হতে বস্ত্র লয় তাই দিয়ে ঢাকি কায়
বর্তমানে 'ডোম' বলি কয়।

গুরুচাঁদ মীড সাহেবের সাথে আলোচনা করে ৩৫টাকা দিয়ে আদমসুমারী রিপোর্ট আনিয়ে দেখলেন সেখানে নমশূদ্র বলে কোন জাতের উল্লেখ নেই। তার বদলে 'চণ্ডাল' লেখা আছে। যারা কোন নিয়ম সংস্কার মানে না। মীডের কথায় গুরুচাঁদ বিধবা বিবাহের আয়োজন করেন। সেন্সাস কমিশনার ছিলেন মিঃ গেটে। সমস্ত নমশূদ্র তারা তার কাছে আবেদন করে। মীড সাহেব লিখে দিলেন, আমি সম্মত। গেটে জাতিমালা গ্রন্থের প্রণেতা ন্যায়রত্নের কাছে জানতে চায়। উত্তরে ন্যায়রত্ন লিখে পাঠায় বাংলায় নমশূদ্র বলে কোন জাতি নাই। 'চণ্ডাল' সকলে তারা প্রমাণেতে পাই। এই চিঠি পেয়ে গেটে আবার মীডের কাচে চিঠি লিখল। মীড সমস্ত মিশনারীদের 'নমশূদ্ররা' অসভ্য নয় একথা লিখতে বলল। মীডের যুক্তি মেনে গেটে ১৯১১ সাল থেকে চণ্ডাল শব্দের বদলে নমশূদ্র লেখা শুরু করেন।

কিন্তু বাস্তবে কি চণ্ডালরা খুব অসম্মানজনক অবস্থায় ছিল। ইতিহাস কিন্তু সেকথা বলে না। ওড়াকান্দীর চৌধুরী পরিবারের একটি ইতিবৃত্ত আছে। সেখানে পাই-- 'আলোচ্য চৌধুরী পরিবারের পূর্বপুরুষগণ যশোহর জিলার ভূ

ষণা মামুদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের সঙ্গে এদেশে আসেন। তখন মগ ও পর্তুগীজ হানাদারদের ভয়ে সমুদ্র উপকূলে জনবসতী একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল। সীতারূপ, বক্তার, ফকির মাছকাটা প্রভৃতির সাহায্যে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে সেই দস্যুদের পর্যুদস্ত করেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি মেনাহাতি ছিলেন চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ।' অধিক কর আদায়ের জন্য মুগল প্রতিনিধি আবু তোরাপ সীতারামের কাছে দূত পাঠায়। সীতারাম তখন জ্ঞানীগুণীজনকে নিয়ে সভা করছিলেন। তখন দূত এসে জানায় যে সাত দিনের মধ্যে কর না দিলে সীতারামকে তার পরিবার সমেত হাজতে পুরবে। এই অপমান সহ্য করা সীতারামের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তিনি আবু তোরাপের মুণ্ডুর জন্য ১০ হাজার টাকা ঘোষণা করলেন। মেনাহাতি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ভূষণার কেল্লা দখল করে আবুকে হত্যা করে তার মুণ্ডু সীতারামের পায়ের কাছে রাখেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের সাথে অন্য জমিদাররা সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সন্ধ্যাবেলায় ছল করে মেনাহাতিকে হত্যা করে। যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত হন এবং মুর্শিদাবাদে তাকে হত্যা করা হয়। প্রতাপাদিত্যের সেনাবাহিনীতে ঢালী সেনা (চণ্ডালদের) শৌর্য ও খ্যাতি বিখ্যাত ছিল। সীতারাম ও প্রতাপাদিত্যের পর বাংলার শাসনক্ষমতা ব্রাহ্মণদের হাতে এসে পড়ে। বলা হতো, বাংলা তিন মজুমদারের। এই ব্রাহ্মণ আমলেই চণ্ডালদের উপর সবথেকে বেশি অত্যাচার শুরু হয়। তাদের অস্পৃশ্য করে জল অচল করা হয়। আমরা দেখছি সীতারাম ও প্রতাপাদিত্যের সময় তাদের অস্পৃশ্য বলা হচ্ছে না। বরং সৈন্য বিবাগে উচ্চপদে আসন দেওয়া হচ্ছে।

ইংরেজ আমলে মিশনারীদের সাহায্যে যখন মর্যাদা আদায়ের লড়াই শুরু হয় ১৮৭২ সালে, যখন উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা এক নমশূদ্রের বাড়িতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে না, তখন এক সভা ডেকে নমশূদ্ররা সিদ্ধান্ত নেয় যে মহিলারা অবশ্যই হাটে বাজারে যাবে না, অন্য জাতের সঙ্গে কোনপ্রকার কাজ করবে না, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোনও হিন্দু জাতের তৈরি খাবার খাবে না। স্পষ্টতঃই সিদ্ধান্তগুলি ছিল ব্রাহ্মণ্যপন্থী। মহিলাদের অধিকার খর্ব করা হলো, অন্য জাতের লোকদের সাথে পার্থক্য বাড়ানো হলো। হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ বা পাগলচাঁদের মত এর বিরোধী ছিল। হরিচাঁদ প্রতিষ্ঠিত মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা কীর্তনে নারীপুরুষ একসাথে কীর্তন করত। তারা সব জাতের সাথে মেলামেশার কথা বলত। তাই এই ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রচেষ্টা মতুয়া দর্শন বিরোধী।

অবশেষে এটা জানা দরকার সত্যিই কী ব্রাহ্মণরা সম্মানীয় ?

বেদের একটা গল্প-- ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার তাসের দেশ নাটকে উপহাস করেছেন, তাসের দেশের লোকেরা ব্রহ্মার হাঁচি থেকে উৎপন্ন। ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের অশ্বমেধ, রাজসূয় যজ্ঞ যা কিনা আসলে পররাজ্য লুণ্ঠন, সেখানে পৌরহিত্য করে প্রচুর দক্ষিণা পেতেন। এরাই সীতারাম রায় ও প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। বাংলায় রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস বিভীষণের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, কলিতে ব্রাহ্মণ সবথেকে নীচু জাতি। যারা তখন ব্রাহ্মণত্বের দাবি করছিলেন তারা কী এসব জানতেন না? এটা আত্মমর্যাদার লড়াই না অপমানকে মেনে নেওয়া সেটা ভেবে দেখার সময় হয়েছে।

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধ হয়েছিল তারা যখন আবার হিন্দু হল তারাই নমশূদ্র, শূদ্রের নমস্য। ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল বলা বড় অপমান। তাই চণ্ডাল নাম মোচন করতে হবে। এই তত্ত্ব নমশূদ্রদের অন্যান্য তপশিলভুক্ত জাতিদের থেকে কী আলাদা করে দেবে না! আবার মতুয়াদের এক অংশ বলে যে মতুয়া এক স্বতন্ত্র ধর্ম। তারা হিন্দু নয়। তবে মতুয়াপন্থীদের এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করা দরকার। কারণ ব্রাহ্মণ পরিচয় বৈদিক সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিজেদের ব্রাহ্মণ বলব আবার বেদ বিরেধী বলবো সেটা তো হয় না ।

বাংলায় ব্রাহ্মণরা কবে এল ?

গুপ্তযুগে শশাঙ্কের সময় কিছু ব্রাহ্মণ এসে থাকতে পারে। পাল রাজত্বে তারা যে ঝর্ম পরিবর্তন করেছিল তার কোনও প্রমাণ নেই। ব রং ইতিহাস বলে পাল রাজত্বে ব্রাহ্মণরা ছিল শাকদ্বীপিয় ব্রাহ্মণ । তারা রাজদরবারে সম্মান পেত। পাল রাজত্বে মন্ত্রী ছিল ব্রাহ্মণ। বরং যারা সমাজের নিম্ন স্তরে ছিল ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় যাদের সম্মান ছল না তারা সম্মান পাওয়ার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। সুতরাং মহানন্দের চণ্ডালদের বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ভাবা সঠিক বলে মনে হয় না। বরং এটা দলিত ঐক্যের পক্ষে একটা কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে হয়।

তবে কী আবার নমশূদ্র নাম ছেড়ে আবার চণ্ডাল নাম নেওয়ার জন্য আন্দোলন শরু হবে? এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রকাশ মন্ডলের রাইচরণ বিশ্বাস প্রণীত 'জাতীয় জাগরণ' পুস্তক ১৫১৮ সালের পুনঃপ্রকাশের প্রসঙ্গ কথায় যেটা লিখেছেন সেটা ভেবে দেখা যেতে পারে বলে মনে হয়।

‘প্রখ্যাত গবেষক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৩০ সালে অক্ষেপ করেন– আমাদের বাংলায় বঙ্গ, বগধ ও চেরো নামে তিনটি জাতি ছিল। বঙ্গজাতি কোথায় গেল? অনেকে অনেক রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোনোটাই মনের মতো হয় না, ঐ দেশটা তাহাদের নামে আজিও চলিতেছে। এই বঙ্গেরা কোথায় গেল, ইহা একটি সমস্যা।

জাতীয় জীবনে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিকে সার্থকভাবে সমাধান করে দেন ড. উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস উক্ত নমশূদ্র মহাসম্মেলনে। ... নমশূদ্রদের বঙ্গ জাতি পরিচয় দাবি করেছেন।

আন্তর্জালে প্রাপ্ত প্রবীর মজুমদারের বক্তব্য দিয়ে লেখাটা শেষ করব। নমশূদ্র - শূদ্রদের মধ্যে নমস্য--- এইরকম একটা আজব আত্মঘাতী ভাবনায় আমরা আত্মশ্লাঘা অনুভব করি। এইরকম ভাবনা কী দলিত ঐক্য বিরোধী নয়। ব্রাহ্মণেরা যেমন আমাদের ঘৃণা করে, তেমনি আমরাও কী আমাদের থেকে নীচু জাতিকে অবজ্ঞা করি না? যদি তা না-ই করি, তাহলে অঅমরা নিজেদের অন্য শূদ্রদের থেকে উঁচু জাত বলে মনে করি কেন? নিজেদের নমস্য শূদ্র বলে দাবি করা মানে জাতিভেদকেই মান্যতা দেওয়া।

ব্রাহ্মণ্যবাদের নতুন আঁতুরঘর

অনন্ত আচার্য

কয়েকজন সাহসী মানুষের প্রতি এই প্রবন্ধটি নিবেদন করছি যাঁরা মনে করেন মতুয়া দর্শনের স্বকীয়তা, বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতা, বস্তুবাদী ভাবনা, সমাজ পরিবর্তনের দিশা, সর্বশিক্ষার নির্দেশ, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, অলৌকিক ঈশ্বরে অবিশ্বাস, নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, সমস্ত অবদমিত জনগোষ্ঠীর আত্মমর্যাদা স্থাপনের প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বজ্রশক্তি ছিল তা চুরি হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। ভারতের মাটিতে ব্রাহ্মণ্যবাদ যখন ক্রুরতম, চতুরতম আধিপত্যকামী অসহনীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে তখন প্রশান্ত রায়, মনোতোষ বৈরাগী, প্রশান্ত বিশ্বাস, নিখিল বিশ্বাসদের প্রতিদিনের ইতিবাচক সমাজকর্মকে লাল/নীল সেলাম জানাতে দ্বিধা করার উপায় নেই। সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস, অনির্বাণ হালদার, জীবন সরকার, সুচেতা গোলদার, রাজু দাস, হর্ষবর্ধন চৌধুরী, সমুদ্র বিশ্বাসও তাঁদের নিজস্ব কুশলতায় এই দ্রোহী দর্শনকে ক্লেদমুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। আইনী মামলার হুমকি এঁদের নিত্যদিনের বিরামহীন প্রচেষ্টাকে থামাতে পারছে না। উত্তরবঙ্গের প্রথম কবিয়াল জনার্দন সরকার-এর নাতি গবেষক সুশান্ত সরকারকে খুনের হমকি দেওয়া হচ্ছে কারণ তাঁর 'অপরাধ' তিনি গুরুচাঁদের 'সুযোগ্য' বংশধর প্রমথরঞ্জন ঠাকুর-এর মুখোশ খোলার কাজ তাঁর গবেষণাপত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলার প্রথম স্তরের কবিয়াল উত্তম সরকার-এর বায়না বন্ধের নোটিশ জারি করা হয়েছে। মতুয়া মহাসংঘ-এর ব্রাহ্মণ্যবাদের সেবাদাস অংশ প্রখ্যাত দলিত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারী-এর রচিত মতুয়া-এক মুক্তি সেনার নাম (প্রকাশক-নিষাদ) বইটি সংগ্রহ ও পাঠ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। চক্রান্তকারীরা হালে পানি পাচ্ছেনা কারণ সমস্ত দলিত সম্প্রদায় (দলনের শিকার মাত্রই দলিত) উপলব্ধি করেছেন যে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ -এর জীবনগাঁথা ও সমাজকর্ম শুধুমাত্র নমো সম্প্রদায়ের একটু অংশের পৈত্রিক

সম্পদ নয়, তা সমগ্র ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত।

রাজহংস তো না-ই, প্রাণীজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষই পারে দুধমিশ্রিত জল বা জলমিশ্রিত দুধ থেকে জল ও দুধকে আলাদা ক'রতে। মতুয়া দর্শনের আকর গ্রন্থ তারক সরকার রচিত *হরিলীলামৃত*-এ দুধ-জল আলাদা করার অনুমতি আছে। তারক সরকার-এর সারল্যকে এবং তাঁদের সময়ের চিন্তা-চেতনার সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার ক'রে ওনাকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় তোলা সঠিক কাজ নয়। চার্বাকের বহু আলোচিত উদ্ধৃতি: ঋণং কৃত্যা ঘৃতং পিবেৎ-কে মাথায় রেখে অনেক গবেষক চার্বাককে আত্মসুখবাদী বা ভোগবাদী আখ্যা দেন। তেমনই হরিচাঁদ-গুরুচাঁদকে পরমব্রহ্ম, অবতার রূপে প্রচার করা প্রকৃতপক্ষে ওনাদের অবমাননা করার সামিল। উদাহরণ হিসাবে জনৈক মতুয়া গবেষকের কথা এসে যায়, তাঁর গবেষণাপত্রে পাতায় পাতায় ভাববাদের 'খিচুড়ি'। বস্তুবাদের নামগন্ধ নেই। এর অন্যতম কারণ হলো, জনৈক 'চাটুজ্যে স্যার' -এর তত্ত্বাবধানে তিনি 'গবেষণা' করেছেন যিনি ফোকলোর (লোকাচার বিদ্যা) বিষয়ে পন্ডিত। কিন্তু মতুয়া ধর্ম তো অবৈদিক অব্রাহ্মণ্যবাদী লোকধর্ম। হাতের কাছে শক্তিনাথ ঝা বা সুধীর চক্রবর্তী মজুদ থাকতে অজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হোলে গবেষণার মেথোডোলজি (প্রণালি) তেই ভ্রান্তির সূচনা নজরে আসে। মতুয়া গবেষক নিজেই যদি ভাববাদী হন তবে পর্বতের মূষিক প্রসব হবার সম্ভাবনা নিশ্চিত। (মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা-অগাস্ট-১৯৯৯ ধর্মপুর-নদিয়া)

যশলোভ, অর্থলোভ বনাম সমাজ

গুরুচাঁদ ঠাকুর-এর জীবনের শেষ বেলায় মতুয়া মহাসংঘ গঠিত হয়। মতুয়াদের 'প্রণামী' বাবদ যে বিপুল অর্থ মহাসংঘে জমা পড়ে তা সমাজকল্যাণ কর্মে খরচ করা হবে এই ছিল গুরুচাঁদ-এর নির্দেশ। প্রমথরঞ্জন-এর কর্তৃত্ব থাকাকালীন বিপুল পরিমাণের অর্থ ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা 'হজম' করে দিতে শুরু করে। দরিদ্র মতুয়াদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কুফল এখন দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণেশ্বর বা কালিঘাটের মন্দিরের মালিকদের মধ্যে শরিকী সংঘর্ষর মতো ঠাকুর পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রতিদিনের ঘটনা। লোকনাথ, অনুকূল, বালক ব্রহ্মচারী, রামঠাকুর, ভবা পাগলা, সন্তোষী(মা) দের সাথে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের তফাৎ মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। প্রমথরঞ্জন ও তাঁর নেতৃত্বে মতুয়া মহাসংঘর অপকর্মের সীমা পরিসীমা নেই। প্রমথরঞ্জন তাঁর *আত্মচরিতে* (প্রকাশক:

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর - মতুয়া মহাসংঘ - শ্রীধাম ঠাকুরনগর, ঠাকুরবাড়ি, পো: ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা- ২য় সংস্করণ- ২৫ মাঘ বুধবার, ১৪০১), যার মুখবন্ধ ড.পরমানন্দ হালদার লিখেছিলেন, নিজেকে জনৈক ব্রাহ্মণ চন্দ্রমোহন-এর উত্তরপুরুষ হিসাবে দাবী করেছেন। তারক সরকারের লেখা *'হরিলীলামৃত'* পুস্তকের প্রথম সংস্করণে ঠাকুর পরিবারের বংশলতিকা নেই। প্রমথরঞ্জন-এর হীনমন্যতার কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ থেকেই একটি কাল্পনিক বংশলতিকা ছাপা হোতে শুরু হয় যা মতুয়া মহাসংঘের অনুমোদনপ্রাপ্ত। শশীভূষণ, গুরুচাঁদ, হরিচাঁদ, যশোবন্ত, মুকুন্দ রায়, নিধিরাম, কালীদাস, সুকদেব, চন্দ্রমোহন প্রভৃতি রামদাস-এর উত্তর প্রজন্ম, শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করার ফলে চন্দ্রমোহনসহ সকলের ব্রাহ্মণত্ব লোপ পায়। ব্রাহ্মণ্যবাদের পদলেহনকারী প্রমথরঞ্জনের এই আষাড়ে গপ্প তার হীনমন্যতার বহিঃপ্রকাশ। গত ২০১১ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ঠাকুরনগরের লাগোয়া এলাকার শিমুলপুরের জনৈক অনাদি সরকার পিতা-বিনয় সরকার (মৃত) নির্বাচন আধিকারিকের কাছে একটি অভিযোগপত্রে জানান যেহেতু মঞ্জুল ঠাকুর একটি সংরক্ষিত বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী এবং যাঁর পিতৃদেব *আত্মচরিতে* তাঁদের পরিবারকে ব্রাহ্মণকুলজাত লিখেছেন সেই কারণে মঞ্জুল ঠাকুর-এর প্রার্থী পদের আবেদন নাকচ করা হোক। ফল হয় মারাত্মক— অনাদি সরকার মহাশয় দুষ্কৃতিদের দ্বারা সস্ত্রীক নিজের বাড়িতে আক্রান্ত হন এবং এখনো পর্যন্ত ঐ পরিবার নিখোঁজ। ড. দ্বৈপায়ন সেন যিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে নিয়ে গবেষণা করেছেন, যিনি এখন মার্কিনদেশে আমহার্স্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাঁর কথায়— গণপরিষদে যখন আম্বেদকর দলিত জনগণের স্বার্থে তথ্য ও যুক্তি সহকারে দাবী তুলেছেন তখন কংগ্রেসের অন্য সদস্যদের সাথে প্রমথরঞ্জন-এর নীরবতা বিস্ময়কর। উত্তরবঙ্গের গবেষক সুশান্ত সরকার-এর তথ্য আরও চমকপ্রদ—ইন্দো-ব্রিটিশ এডুকেশন আর্কাইভ-এ ১৯২৬ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত ভারতের একজন মাত্র বার-এট-ল (ব্যারিস্টার)-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে তিনি প্রমথরঞ্জন নন- ঢাকা বাসিন্দা নাজমা খাতুন। ইদানিংকালে মমতা ব্যানার্জী বা পবিত্র সরকার-এর জাল ডিগ্রীর কথা শোনা যায় কিন্তু অতদিন আগে সরল ভক্ত গোপাল সাধুর অর্থ সাহায্যে বিদেশে ফূর্তি করতে যাওয়া উন্নত পর্যায়ের তঞ্চকতা।

টাকা মাটি মাটি সোনা। সুভাষ চক্রবর্তীর কল্যানে জমি হাঙরদের কথা

শোনা প্রথম শোনা যায়। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে প্রমথরঞ্জন গাইঘাটা-শিমুলপুর এলাকার দরিদ্র উদ্বাস্তুদের সর্বস্বান্ত করেছিলেন তার খোঁজ কে রাখে? ওই অঞ্চলের ভূমিসন্তান মুসলমানরা কোথায় গেল কে জানে? এব্যাপারে প্রমথরঞ্জন-এর সাথী ছিলেন বিপিন বিহারী মজুমদার। এই মজুমদার মহাশয় যদিও কবি বিনয় মজুমদার-এর জন্মদাতা তবুও তাঁর অন্য একটি পরিচয় আছে। উনি বার্মা সরকারের উচ্চপদস্থ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের জমি মাপ-এর দক্ষতা, 'ঠাকুরবাড়ি'র কাছাকাছি থাকার জন্য ভক্তদের আগ্রহের সাথে প্রমথরঞ্জন-এর সাথে তৎকালীন কংগ্রেসের নেতাদের ঘনিষ্ঠতা ঠাকুর ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাইভেট) লিমিটেড, বাণিজ্যিক সফলতা পায়।

কল্যানী বিশ্বাস তাঁর গবেষণাপত্রে জানাচ্ছেন— নমো বা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মাত্র ১৯ শতাংশ মানুষ মতুয়া শব্দটি সম্পর্কে জ্ঞাত। কেউ কম জানেন কেউ বা একটু বেশি। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না।

''নমঃশূদ্র, তেলি, মালী আর কুম্ভকার, কপালি মাহিষ্য দাস চামার কামার। পোদ আসে তাঁতি আসে আসে মালাকার। কতই মুসলমান আসে ঠিক নাহি তার (*গুরুচাঁদ চরিত* - মহানন্দ হালদার)।

''মতুয়া ধর্ম গ্রহণ ক'রে অনেক ব্রাহ্মণ পৈতা ধারণের অসারতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং পৈতা বর্জন করেছিলেন। ফরিদপুর জেলার দিখলীয়া গ্রাম নিবাসী মধুসূদন চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র অক্ষয় চক্রবর্তী (অন্যমতে অক্ষর চক্রবর্তী)-এর নাম করতেই হয়'' --- (মতুয়া ধর্ম ও অনুষ্ঠান বিধি-সুধীর রঞ্জন হালদার--- গুরুচাঁদ প্রকাশনী-পালপাড়া, চাকদহ নদীয়া-২০১১)। ধীরেন ব্যানার্জী, রাধানাথ ব্যানার্জীরও নাম পাওয়া যায়--- (তথ্যসূত্র-*প্রশ্নোত্তরে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ*-শ্যামল বিশ্বাস)। মুসলমানদের মধ্যে শেখ জালালুদ্দিন, তিনকড়ি মিঞা, চাঁদ গাজী সপরিবারে মতুয়া হোয়েছিলেন। বিখ্যাত গায়ক দেলওয়ার হোসেনও মতুয়াদের সাথে ওঠাবসা করতেন। তিনকড়ি মিঞার সাথে এক অমুসলমান মতুয়া কন্যার বিবাহ হয়'' (ঐ)। হিন্দু কি যবনে ঘৃণা নাহি মনে/ভোজনে ছিল রীতি।/যে করে আদর যায় তার ঘর/বিচার নাহিক জাতি।

বর্তমান মতুয়া মহাসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এমন কোনও ব্যক্তির নাম পাওয়া যাবে না যে নমো পরিবারভুক্ত নন। এদের অধিকাংশই ১০০ শতাংশ মুসলিম বিদ্বেষী এবং ব্রাহ্মণ কুলজাতদের মুক্তমনা অংশের প্রতি কুৎসাবাজ।

অথচ 'হিন্দু-মুসলমান আছি দেশভরে। এক ভাষা, এক আশা, এক ব্যবসাতে কেনবা কবির বর্ণ তাহাদের সাথে দুই ভাই এক ঠাঁই বহ মিলেমিশে' (*গুরুচাঁদ চরিত* - মহানন্দ হালদার)।

হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ-এর জীবনচর্চা ও কর্মজীবনের সারমর্মর বিপক্ষে ওড়াকান্দির ঠাকুরবাড়িতে প্রথম দুর্গাপুজো হয়। এ নিঃসন্দেহে মতুয়া পথের সাথে মেলে না। এ গুরুচাঁদ ঠাকুর-এর সাথে পুত্র শশীভূষণ-এর মতান্তরে গুরুচাঁদ-এর সাময়িক পরাজয়। এই দুর্গাপুজো সম্পর্কে দুটি কথা ভাসে যা শ্রুতি মারফত আলোচিত হয় যে শশীভূষণ গুরুচাঁদ-পুত্র হোলেও মনেপ্রাণে মতুয়া ছিলেন না। চাঁদসি চিকিৎসক পরিবারের জামাই হবার ফলে 'বাবু ভদ্দরলোক'দের সাথে ওঠাবসা বেশী ছিল। তার উপর ঠাকুর পরিবারের প্রথম প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সরকারী চাকুরীজীবী। ফলে দেশের ঘোষালবাড়ি, চাটুজ্যেবাড়ি, চৌধুরীবাড়ির সাথে টক্কর দিয়ে দুর্গাপুজো না করলে ইজ্জত থাকে না। ফলে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হোল। যে গুরুচাঁদ বলেন: দশ হাতা বেটি আসে দশ হাতে গায় / ওর পুজো দিতে গেলে রাজা হো'তে হয়। এ বিষয়ে সন্তানের সাথে বাদানুবাদ হোলে দুর্গাপুজোর সময় আদর্শচ্যুত না হোয়ে গুরুচাঁদ বেশ কয়েকদিনের জন্য অন্য স্থানে বাস করেন। যাবার আগে ছেলেকে বলে যান: তোরা যা শুরু করেছিস আজ থেকে ৭ পুরুষ বাদে কেউ ঠাকুরবাড়ির নাম মনে রাখবে না। এখন যা দেখা যাচ্ছে গুরুচাঁদ-এর আশঙ্কা তাঁর নির্দ্ধারিত সময়ের আগেই বাস্তবায়িত হতে চলেছে। অন্য একটি মতকে অবশ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। খৃষ্টধর্মযাজক মীড-এর সাথে গুরুচাঁদ-এর সুসম্পর্ক নিয়ে নানা বিরূপ কথা শোনা যায়। ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়ির লোকজন যে সমস্ত নমো জনগোষ্ঠীকে খৃষ্টধর্মের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তা গুরুচাঁদ-মীড-এর পরিকল্পনা প্রসূত - এই ধারণাকে অসত্য প্রমাণ করার জন্যই দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। এটা মোদ্দা কথা যে গুরুচাঁদ জীবৎকালেই ব্রাহ্মণ্যবাদের আক্রমণ শুরু হোয়ে গিয়েছিল। যে চতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সম্বন্ধে ঋগবেদ-এর যাবতীয় ব্যাখ্যা রয়েছে কেবলমাত্র ১০.৯০ সুক্তে। যেখানে বলা হোয়েছে, বর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল প্রাচীন দেবাতা 'সাধ' নামে এক আদিমানবকে বলিদানের পর। এই 'সাধ' মনে হয় প্রাগার্য দেবতা, যার কথা বিশেষ পাওয়া যায় না। ঐ স্তোত্রটির অর্থ হোলো বর্ণীয় কর্তৃত্ব এবং তা এমন এক সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে যে ব্যবস্থায় বলপ্রয়োগ ও প্রথা ছাড়া উপায় নেই।

গোত্র অহমিকা— হীনমন্যতা বা জালিয়াতি!

দি অরিজিন অফ ব্রাহমিন গোত্রম (জার্নাল অফ দি বোম্বে ব্রাঞ্চ অফ দি রয়াল-এ সিভিক সোসাইটি ২১৯৫০ পৃ: ২১-৮০), প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ কোসম্বী-এর *ব্রাহ্মিন ক্লান* গোত্র বিষয়ে অনেক তথ্য জোগান দেয়। তবে জে ব্রাউ তাঁর লিখিত গবেষণাপত্রে যা পরবর্তীকালে *দি আর্লি ব্রাহমিনিকাল সিসটেম অফ গোত্র অ্যান্ড প্রবর* (কেম্ব্রিজ-১৯৫৩) নামক গ্রন্থে ব্রাহ্মণত্বর পাহারাদারদের উলঙ্গ করে দিয়েছিলেন। ঐ গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি লিখে ছেন যে ব্রাহ্মণরা মূলতঃ শ্রমবিমুখ (ওঁর ভাষায় প্যারাসাইট অর্থাৎ পরগাছা) ছিলো ফলে তারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যদের থেকেও দূরে থাকতে পছন্দ করতো। ক্ষমতার সিংহাসন দখলে রাখতে ক্ষত্রিয়দের প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকতো। বৈশ্যদের বাণিজ্যে লাভও যেমন থাকত লোকসানের আশঙ্কাও থাকত, শূদ্র বা অতিশূদ্রদের গোলামগিরি ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিলো না। ভয়কাতর ব্রাহ্মণদের সুচতুর ষড়যন্ত্রের পথ খুলে গেল যখন বংশলতিকার শীর্ষে কোনো এক মুনিঋষির নাম বসিয়ে দিলে সারাজীবন বংশপরম্পরা ধর্মশাস্ত্রর দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত (শ্রমবিমুখ) থাকতে পারলো। ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের আনুগত্য পেয়ে শূদ্র দমন কঠিন কাজ ছিলো না, আজও নয়।

রসিকতায়জে ব্রাউ অনন্য। 'আজ আমরা ইউরোপবাসীরা কোনোরকমে পিতামহ-এর নাম বলতে পারি কিন্তু প্রপিতামহ-এর নাম মনে রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ে। তখন প্রাক্-আধুনিক ভারতীয় উপমহাদেশে ২০০-৩০০ বা তার বেশী সময় আগের কোনো এক মুনিঋষির কল্পনাপ্রসূত নাম ব্যবহার করে বংশমর্যাদা বৃদ্ধির অপচেষ্টা করে, একধরনের তঞ্চকতা (জে ব্রাউ-এর ভাষায় ফ্রড) ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না'। কোসম্বী তাঁর পূর্বপুরুষ বশিষ্ঠকে **ভুঁইফোঁড়** বলতে দ্বিধা করেননি। ইদানিং যাঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদকে আক্রমণ করতে গিয়ে মুক্তমনা প্রাক্তন ব্রাহ্মণদের আক্রমণ করেন তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই— প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ কোসম্বীও ব্রাহ্মণ কুলজাত।

পরাশর সরকার গোত্র বিষয়ে গবেষণা করেছেন (*গোত্র গোত্রান্তর*-কালপুরুষ প্রকাশনী, ১৯৬৩)। ইতিহাসবিদ ডি ডি কোসম্বী তাঁর লিখিত বই (*দি কালচার এন্ড সিভিলাইজেশন অফ অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া ইন হিস্টরিক্যাল আউটলাইন*-বিকাশ-নিউ দিল্লী-১৯৭২)তে গোত্র নিয়ে প্রচুর তথ্য দিয়েছেন।

এঁদের বক্তব্যর নির্যাস হল— গোত্র নির্দ্ধারণের কোনও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি জানা যায় না। একটি মত— যেহেতু পুরানকালে গো সম্পদের বিপুল অধিকারীরাই সমাজকর্তা ছিলেন তাঁরাই নিজেদের পূর্বপুরুষের কল্পিত নামে নিজেদের বংশমর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। পরাশর সরকার মহাশয় তাঁর বই-এর ১১৭-১১৮ পাতায় লিখেছেন- ''গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, আত্রেয়, সান্ডিল্যদের ব্রহ্মার সন্তান বলা হোত এবং তাঁরা অবশ্যই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দাবীদার ছিলেন''। অব্রাহ্মণ বিশেষতঃ শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের সাধ ও সাধ্য ছিল না। উপরোক্ত কয়েকজন যদিও আরও ৪৯টি গোত্রের জন্ম দিয়েছেন তবে একথা তো স্বীকার করা যায় না যে এঁরা স্বয়ম্ভূ ছিলেন বা আদিম যুগের প্রথম মানব জনম নিয়েছিলেন। ঋকবেদ অনুসারে গোত্র শব্দের অর্থ যুথ। ছান্দোগ্য উপনিষদ অনুসারে গোত্রর অর্থ গোষ্ঠী। এতে আপত্তি করার তেমন কিছুই নেই, কিন্তু এইসময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে মানবসভ্যতার অগ্রগতির মূল কারিগরদের সম্পর্কে লিখিত ইতিহাসের বয়স দু-তিনশত বৎসর মাত্র। তাঁদের বংশমর্যাদা প্রচারের অপচেষ্টা হীনমন্যতার নামান্তর মাত্র। ব্রাহ্মণরা উচ্চগুণসম্পন্ন— এই জাতীয় ভিত্তিহীন ভাবনার শিকার হন প্রমথরঞ্জন ঠাকুর। কোনও সৎ উদ্দেশ্য এ ধারণাকে মান্যতা দিতে পারে না।

প্রসঙ্গত এ বিষয়ে দুজন বিজ্ঞান শিক্ষকের কথা বলা যায়। দুজনেই এই কলমচির স্বজন এবং সুজন, তাই নাম প্রকাশের বাসনা নেই। দুজনেই আম্বেদকর-এর দ্বিধাহীন বিদ্বেষী, পরিচয়ের রাজনীতি সম্পর্কে চূড়ান্ত উদাসীন। একজন নিজস্ব রান্নাঘরে তৈরি মার্কসবাদে (যা মার্কস-এর রচনায় পাওয়া যাবে না।) বিশ্বাসী বলে দাবি করেন। তিনি তাঁর ভাষায় অবদমিত জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় সমাজে অন্তর্ভুক্ত হবার উপদেশ দেন এবং 'ভদ্দরলোকের' রাজনীতিতে, সামাজিক কাঠামোয় অংশগ্রহণ করতে বলেন। অপরজন ব্রাহ্মণ কুলজাত সাজার অলীক কল্পনা বিলাসে দিন কাটান। এতো আত্মসম্মান বোধের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। তিমি বা তিমিঙ্গিল (যারা তিমিকেও গিলতে পারে) দের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন (আপাততঃ) ব্রাহ্মণ্যবাদের কাঠামোর 'নাট-বল্টু' হওয়ার অপবাসনা মাত্র ।

আবার মতুয়া প্রসঙ্গে আসা যাক। মালদার গবেষক শিক্ষক জীবন সরকার মনে করেন— কর্ণাটকের লিঙ্গায়েতের গোষ্ঠীর মতো মতুয়াদের ঘোষণা করা উচিত উই আর নো মোর হিন্দুস—আমরা আর হিন্দু নই। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাধবে কে? সরল মতুয়া যাদের মধ্যে পাগল, গোসাই, দলপতিরা

আছেন, তাঁদের নিত্যদিন মতুয়া মহাসংঘের নেতৃবর্গ প্রতারণা করছে। মতুয়া মহাসংঘের নির্বোধ নেতৃত্ব মতুয়াদের আম্বেদকর, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহ দেখাতে প্রতিনিয়ত নিষেধ করছে। যে আম্বেদকর-এর কল্যানে নমো সহ সমস্ত অবদমিত জনগোষ্ঠী সামান্য একটু নিশ্বাস ফেলার পরিসর খুঁজে পেয়েছে। যে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল হিন্দুত্ববাদের মৃগয়া ক্ষেত্র আজকের ভারতের দলিত মুসলমান ঐক্যের অন্যতম পথ প্রদর্শক, যে গৌতম বুদ্ধ ভগবান তত্ত্ব খারিজ করে বস্তুবাদের অনুসারী হোতে বলেছিলেন, তাঁদের বাতিল করে মতুয়া মহাসংঘ নেতৃত্ব কার্যত হরিচাঁদ-গুরুচাঁদকেই অমর্যাদা করছেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদের নতুন আঁতুড়ঘর ঠাকুরনগর ও ওড়াকান্দির 'ঠাকুরবাড়ি'তে যাতায়াত বন্ধ করে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ-এর বিকল্প বিদ্রোহী দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো বিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে। নতুবা সামনে অন্ধকার দিন দেখা যাবে।

গৌরবময় কৃষক আন্দোলনের ধারা যা গুরুচাঁদ-এর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল তার উত্তরাধিকার বহন করতে হলে আজ বাংলায় মতুয়াদের / নমোশূদ্রদের কৃষকদের সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

রাজনৈতিক কাঠামোয় ঢুকে ব্রাহ্মণ্যবাদী দলের সেবাদাস বা সেবাদাসী হওয়ার তুলনায় আপাতত রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে থেকে আত্মমর্যাদার আন্দোলন শুরু করতে হবে। সর্বশিক্ষা অভিযানের অসাফল্যকে মাথায় রেখে বিকল্প শিক্ষা অভিযান শুরু করতে হবে। নমোশূদ্র ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত দলিত সম্প্রদায় (দলনের শিকার মাত্রই দলিত)কে আন্দোলনের সাথী হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে। ব্রাহ্মণ্যবাদী স্বৈরাচারী শাসনে পীড়িত সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমমর্যাদা দিতে হবে। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের যে সূচনা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ করেছিলেন তার পরম্পরাকে ধরে রাখতে হবে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

'ঢলাঢলি কান্দাকান্দি' বন্ধ করে সমাজ সচেতন মতুয়া মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে যেখানে সবরকম 'দলিত-পতিত সমাজ' অংশগ্রহণ করবে। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদকে অবতার বা ভগবান হিসাবে পরিচিত করার ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে। সামনে অনেক কাজ। বিশ্রামের কোনো সুযোগ নেই।

ভারতবর্ষ মানে

দেবেশ ঠাকুর

ভারতবর্ষ মানে কোনও
আর্ট পেপারে আঁকা জলরঙের মানচিত্র নয়;
ভারতবর্ষ মানে শুধু
হর্ষবর্ধন কিংবা বাবরের বিজয়বার্তা নয়;
ভারতবর্ষ মানে
বিজয়সিংহের সিংহল জয়ের ফ্যাসিস্ট গৌরবগাথা নয়;
ভারতবর্ষ মানে শুধু
মীনাক্ষীপূরম কিংবা জামা মসজিদ নয়;
ভারতবর্ষ মানে নেহরুজির বংশানুবৃত্তি
কিংবা জিন্নাসাহেবের অলিখিত শ্বেতপত্র নয়;
ভারতবর্ষ মানে এক ভালবাসা
আমার তোমার শব্দের সঙ্গীতের জীবনের আত্ম
কাশের মাটির
আমাদের প্রাইমারি স্কুলে
কলু খাঁ সাহেব
সাদা দাড়ি মাথায় ফেজ
ড্রিল করাতেন আমাদের - ডান বাঁ - ডান বাঁ
সস্নেহে সতর্ক করতেন, বাপ সকল
পা আর হাত মিলিয়ে মিলিয়ে ফেল
কলু খাঁ সাহেবের গোরের মাটিতে
আজ ফেরেস্তার হাসি
ভারতবর্ষের চেরাগ হয়ে জ্বলছে...
বদ্রু মিঞার হাতের কর্ণিকে
শিবমন্দিরের গায়ে কত ফুল কাটা,
আর তার জোগাড়ে হয়ে
মশলা মাখছে ঈশান বাউরি;
নিয়ামত সেখ আর গোকুল মাহাতো
এক পাটাতনে ধান ঝাড়ে
সোনালি গোবিন্দভোগে
খামারে ঠিকরে পড়ে সোনালি আলো...
পবন মাঝি দাঁড় টানতো যুবতী গঙ্গায়
বৈঠা ধরত হোসেনুর মাঝি
সামলে চলো মাঝি, ছামুতে কাঁচা খাকির গাঙ
চোরাবালির চর আর
ঘূর্ণিজলের ঘাট ...
আমার ভারতবর্ষে কোনও গেরুয়া রাজনীতিবিদ
কিংবা
ইমামের নির্দেশিকা নেই;
এখানে কোনও সংহিতা - হাদিশ ছাড়াই
কোজাগরি চাঁদের অকৃপণ আলো পড়ে ঈদগা-র
উপর
আর রমজানী চাঁদ তুলসিমঞ্চের গায়ে
পূর্ণ আলো দেয় ...
আমার ভারতবর্ষ মানে
রবি ঠাকুরের মধ্যে নজরুল,
রবিশঙ্কর আর আলি আকবরের যুগলবন্দি,
গণেশ পাইন আর মকবুল ফিদার রঙিন ছবি,
আমার ভারতবর্ষ মানে
লালন ফকিরের গান,
আমার ভারতবর্ষে আমি শুনেছি
মহম্মদ রফির সঙ্গে লতার ডুয়েট,
দেখেছি পাল্লা দিয়ে আজহারের সঙ্গে সচিনের দৌড়,
খেলার মাঠের প্রান্ত দাঁড়িয়ে শুনেছি
নইমউদ্দিনের তদারকি চিৎকার
''বিজয়ন-আকিল-কুলজিৎ-বাইচুং
মাঠটাকে আরও বড়ো কর''—
মাঠ দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে
মাঠটাকে আরও বড়ো করা দরকার
অনেক অনেক বড়ো ...